শ্রীসারদাদেবীর জীবনকথা

স্বামী বেদান্তানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

এ যুগের যে প্রয়োজন সাধনের জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হয়েছিল তা ধীরে ধীরে সিদ্ধ হতে চলেছে। তাঁর জীবন ও শিক্ষার দিনে দিনে ব্যাপক প্রচার হচ্ছে—তাঁকে আদর্শ করে দেশ-বিদেশের অসংখ্য নরনারী নিজেদের গড়ে তুলছেন।

যে মহৎকার্য সাধনের জন্যে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন সে কাজের সহায়করূপে পেয়েছিলেন তাঁর উপযুক্ত শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে আর সহধর্মিণী সারদাদেবীকে। নানা কারণে সারদাদেবীর জীবন ও শিক্ষার তেমন আলোচনা এতকাল হয় নি। কিন্তু এখন তাঁর জীবন ও বাণী জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার উপযুক্ত সময় এসেছে। তাঁর চরিত্রের অনুসরণে নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে পারলে আমাদের দেশের মেয়েরা ধন্য হবে এবং দেশকে উন্নত করবে। তাঁর জীবনের অসাধারণত্ব সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। মাঠাকুরাণী (সারদাদেবী) ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন। তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী-মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।"

সাধনার ক্ষেত্রে যাঁরা বড় হন বা সাধনরাজ্যের পথ যাঁরা দেখাতে আসেন তাঁদের জীবনে নানা অলৌকিক দর্শন ও অনুভব ঘটে থাকে। সারদাদেবীর জীবনেও ঐরূপ দর্শনাদির বহু দৃষ্টান্ত আছে। এই বইয়ে সে-সব যথাসম্ভব বাদ দেওয়া হয়েছে। বইখানা প্রায় চোদ্দ বৎসর পূর্বে লেখা হয়। তখন পর্যন্ত সরল ভাষায়, বিশেষভাবে ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে, শ্রীসারদাদেবীর জীবনী লেখার চেষ্টা বোধ হয় কেহ করেন নি। এই বইখানা লেখার প্রয়াসের সঙ্গে এক অক্লান্ত কর্মশীল ভক্তের স্মৃতি জড়িত আছে। সেটা এখানে উল্লেখ করা কর্তব্য। হাওড়া-খুরুট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ব্যায়ামাচার্য ৺রাধাকান্ত মল্লিকের উৎসাহে বইখানা লেখা শুরু করি। তিনি বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং ছেলেমেয়েদের শারীরিক

উন্নতির সঙ্গে তাদের নৈতিক চরিত্র বিকাশের প্রতি সমানভাবে নজর দিতেন। বইখানা তিনিই ছাপাবেন বলেছিলেন। কিন্তু অকালে তাঁর দেহান্ত হওয়ায় আমি নিজে ছাপাবার কোন চেষ্টা করি নাই।

সারদাদেবীর অন্যতম সন্ন্যাসী-শিষ্য পূজ্যপাদ স্বামী শান্তানন্দজী সম্প্রতি পাণ্ডুলিপিখানা পড়ে বইখানা প্রকাশ করার জন্যে আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করেন। তাঁর আগ্রহে এবং স্বর্গত ধর্মপ্রাণ সিভিলসার্জন কালিদাস পাল মহাশয়ের সুযোগ্যা সহধর্মিণী রাঁচি নিবাসিনী ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা ক্ষেত্রমণি দেবীর স্বতঃপ্রণোদিত আর্থিক সহায়তায় বইখানা এতকাল পরে প্রকাশ করা সম্ভব হল। বইখানা লিখতে ও ছাপাতে যাঁদের এবং যে-সব পুস্তক ও পত্রিকার সাহায্য পেয়েছি সে সকলের লেখক ও প্রকাশকগণকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিনীত
লেখক

শ্রীসারদাদেবীর জীবনকথা

প্রথম অধ্যায়

পিতৃপরিচয়

সন ১২৭১ সালের কথা। সে-বৎসর বাঙ্গলাদেশের বড় দুর্দিন—কোথাও বা বন্যার প্লাবন, কোথাও বা জলাভাবে দুর্ভিক্ষের হাহাকার। বাঁকুড়া জেলায় হয়েছে অজন্মা। সেখানকার লোকে মরছে অন্নাভাবে হা-হুতাশ করে।

বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ-পূর্ব সীমায় আছে জয়রামবাটী নামে এক ছোট গ্রাম। গ্রামের উত্তরদিক বেড় দিয়ে বয়ে চলেছে আমোদর নদ। সেটি বেশি চওড়া বা গভীর না হলেও বারোটি মাস তাতে জল পাওয়া যেত। কিন্তু অনাবৃষ্টির জন্য তারও জল আজ শুকিয়ে এসেছে। যে জয়রামবাটী গ্রামের চারিপাশের ক্ষেতসকল নানা ফসলে বারো মাস সবুজ হয়ে থাকত সে গ্রামেও দেখা দিয়েছে দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া।

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে এক গরীব রামভক্ত ব্রাহ্মণের বাস ছিল ঐ গ্রামে। সামান্য কয়েক বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তি, কয়েক ঘর যজমান এবং তুলো থেকে সুতো কেটে পৈতা বিক্রয়—এইসব থেকে তাঁর যে আয় হ'ত তা দিয়ে সেকালের ব্রাহ্মণের সাদাসিধে জীবনযাত্রা একরকম স্বচ্ছন্দেই চলে যেত। শুধু নিজেরাই যে পেটভরে খেতেন তা নয়, ভিক্ষুক বা অতিথিকেও বিমুখ করতেন না। দেশের এই দুর্দিন দেখে তিনি ভাবছেন, ভগবানের কৃপায় আমার যে ধান হয়েছে তাতে কোনও রকমে সংবৎসর কুলিয়ে যাবে—আর গত বছরের কিছু ধানও ঘরে মজুদ আছে। ঘরে অন্ন থাকতে ক্ষুধিতের হাহাকার দেখি কি করে? যতদিন পারি রোজ যে ক'জনের করে সম্ভব

তাদের মুখে অন্ন তুলে দিই। ভগবানের ইচ্ছায় তারপর যা হবার হবে। এই ভেবে তিনি নিজের সংসারের খরচও যতদূর পারা যায় কমিয়ে ফেললেন। ব্যবস্থা হ'ল, তাঁর পরিবারের লোকজনের জন্য যে পরিমাণ দরকার তার অতিরিক্ত আরও কয়েক হাঁড়ি কলাইয়ের ডালের খিচুড়ি রোজ দুপুরে রান্না করা হবে। বাড়ির সকলে ঐ খিচুড়ি খাবে, আর যে সব লোক না খেয়ে এসে হাজির হবে তাদের মধ্যে ঐ খিচুড়ি বিতরণ করা হবে। ব্রাহ্মণী শ্যামাসুন্দরীও কোন অংশে স্বামীর চেয়ে কম ছিলেন না। খেতে না পেয়ে লোকে যে কষ্ট পাচ্ছে তা দেখে তাঁরও প্রাণ গেল গলে। সুতরাং দুজনে মিলে সাধ্যমত করে চললেন ক্ষুধায় কাতর লোকেব সেবা। তাঁদের এগারো বছর বয়সের বড় মেয়ে সারদাও আনন্দ পেত এ কাজে বাপ মায়ের সাহায্য করতে। ক্ষুধিত লোকদের কষ্ট দেখলে তার কোমল প্রাণটা উঠত কেঁদে। হাঁড়ি থেকে খিচুড়ি ঢালা হ'লে যাতে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয় সেজন্য সে দু হাতে জোরে জোরে খিচুড়ির উপর বাতাস করত।

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিশেষ লেখাপড়া জানতেন না, শ্যামাসুন্দরী দেবীর তো বোধ হয় কোনদিন অক্ষর পরিচয়ও হয় নি। কিন্তু তাতে কি আসে যায়! সত্য, দয়া, সরলতা প্রভৃতি যে সব গুণ থাকলে মানুষ সত্যই মানুষ বলে গণ্য হ'তে পারে সে সব গুণ তাঁদের দুজনেরই ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। রামচন্দ্র ছিলেন খুব ভক্ত, দয়ালু, নিষ্ঠাবান, অমায়িক এবং অতি সরল। যার তার দান তিনি নিতে পারতেন না। কোন লোককে তাঁর সদর দরজা পার হয়ে যেতে দেখলেই তিনি তাকে ডেকে বলতেন, "এসো ভাই! এক ছিলিম তামাক খেয়ে যাও!" শ্যামাসুন্দরী দেবীও ছিলেন অতি সরল এবং দয়ালু। অপরের সেবা বা উপকার করতে তাঁর ছিল বড় আনন্দ।

লোকজনকে খাওয়াতে এবং যত্ন করতে তিনি খুব ভালবাসতেন। এই সব গুণ তাঁদের ছিল বলেই বোধ হয় শ্রীসারদাদেবীর মত মেয়েকে তাঁরা কন্যারূপে পেয়েছিলেন। সারদাদেবীর জীবনের ও শিক্ষার কথা কিছু আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারব, তাঁর মত মেয়ে তো জগতে যেখানে সেখানে যখন তখন জন্মায় না। তেমনটি মেয়ের মা-বাপ হওয়া কি কম ভাগ্যের কথা!

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাল্যকাল ও শিক্ষা

সারদাদেবী বাপমায়ের প্রথম সন্তান। সন ১২৬০ সালের ৮ই পৌষ (ইংরাজি ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর) বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। পঞ্জিকার হিসাবে সেদিন ছিল অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি। বাপমায়ের স্নেহযত্নের মধ্যে বালিকা দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল। দেখতে দেখতে তার বয়স পাঁচ বৎসর পেরিয়ে ছয়ে পড়ল। এই বয়সে ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসে হ'ল তার বিয়ে। আজকালকার, বিশেষ করে শহরের শিক্ষিত মেয়েদের কাছে, এ কথাটা খুব অদ্ভুত ঠেকবে। কিন্তু আমরা যে সময়কার কথা বলছি, তখন লোকে এরকম বিয়েকে অন্যায় বা অস্বাভাবিক বলে মনে করত না।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম শোনে নি এমন ছেলে-মেয়ে আজকাল বোধ হয় বাঙ্গলা দেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর জন্মস্থান ছিল জয়রামবাটীর অতি নিকটে—মাত্র তিন মাইল দূরে, হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন ভগবানের নামে মাতোয়ারা। যখন তাঁর বয়স প্রায় কুড়ি

বছর, সেই সময়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির স্থাপিত শ্রীশ্রীকালীমন্দিরে পূজারী নিযুক্ত হলেন। ভারতে মন্দিরের সীমা-সংখ্যা নাই। সে-সব মন্দিরে দেববিগ্রহ আছেন অগণিত—আর তাঁদের সেবায় নিযুক্ত আছেন লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ। দিনের পর দিন তাঁরা দেবতার পূজা করেন, ভোগ দেন, প্রসাদ পান—নিশ্চিন্তে তাঁদের দিনগুলি যায় কেটে। ভোগ দিলে দেবতা খান কি না খান, এসব চিন্তা কোন দিন তাঁদেরকে ব্যস্ত করে তোলে না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন এক নূতন ধরনের পূজারী। পাঁচজনে যা করে বা বলে তা মেনে নিয়ে তিনি খুশী হ'তে পারতেন না—সব কিছু যাচিয়ে বাজিয়ে পরীক্ষা করে নিতে চাইতেন। শোনা কথায় বিশ্বাস করে তাঁর মত তৃপ্তি পেত না কোন দিন। পূজকের কাজ গ্রহণ করার পর প্রতিক্ষণে তাঁর মনে হ'তে লাগল—সত্যসত্যই জগৎ-জননী কালী আছেন কিনা। আর তিনি থাকলেই বা কি লাভ, যদি ভক্তের প্রার্থনা তিনি না শোনেন, তাঁকে দেখা না দেন। ভগবানের দর্শন পাবার জন্যে তিনি পাগল হলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শাস্ত্রের বিধান মেনে নিয়মমত পূজা করা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। দিনরাত প্রার্থনায়, সাধুভজনে কেটে যেতে লাগল। দেহের উপর কোন যত্ন নাই—আহার-নিদ্রা সব ভুল। সারাক্ষণ মুখে কেবল 'মা মা' রব। তাঁর প্রাণের বেদনার কথা সাধারণ সংসারী লোকে কি বুঝবে। তাদের ধারণা হ'ল তিনি পাগল হয়েছেন। তা না হলে, ভগবানের নাম তো অনেকেই করে, দিনের শেষে মায়ের দেখা পেলাম না বলে তাঁর মত গঙ্গাতীরে মুখ ঘষড়ে কে আর রক্ত বের করে ফেলে? কেবল রাণী রাসমণির জামাই মথুরবাবু প্রভৃতির ন্যায় দু-চারজন ভাগ্যবান ব্যক্তি তাঁর ভক্তি-বিশ্বাস দেখে মুগ্ধ হ'লেন এবং মহাপুরুষ জ্ঞানে তাঁর সাধ্যমত সেবাযত্নের ব্যবস্থা করলেন।

সাধারণ লোকের যেমন স্বভাব, তারা শ্রীরামকৃষ্ণের মনের অবস্থা কিছু বুঝতে না পেরে তাঁর সম্বন্ধে নানা কথা খুব ফলিয়ে চারিদিকে রটিয়ে বেড়াতে লাগল। সে-সব গুজব কামারপুকুরে পৌঁছুতে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জননী চন্দ্রাদেবী ও দাদা রামেশ্বরের কানে যেতে বেশি দেরি হ'ল না। খবর শুনে তাঁরা বড় ব্যাকুল হলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে বাড়িতে আনালেন। বাড়িতে এসে কিছুকাল বাসের পর তিনি অনেকটা শান্ত হ'লেন। যাঁকে দেখার আশায় তিনি দিনরাত কাঁদছিলেন তিনিই হয়তো এই সময়ে কৃপা করে তাঁকে দর্শন দিচ্ছিলেন।

তিনি অনেকটা সহজ মানুষের মত চলাফেরা করছিলেন বটে, কিন্তু শ্মশানে বসে ধ্যান প্রভৃতি তাঁর ছেলেবেলার অভ্যাসগুলো দেখা গেল তেমনিই আছে। সংসারের সব কাজে উদাসীন ভাব তাঁর আগের মতই রয়ে গেল। এইসব দেখে তাঁর মা ও ভাই পরামর্শ করলেন— বিয়ে দিতে পারলে এসব চলে যাবে। পাড়াপ্রতিবেশীরা যে সে কথায় সায় দিল তা আর না বললেও চলে। গদাধর (সন্ন্যাসী হবার আগে শ্রীরামকৃষ্ণের এই নাম ছিল) এসব যুক্তি পরামর্শ শুনলেন, কিন্তু কোনরূপ ওজর আপত্তি করলেন না। চারদিকে পাত্রীর অন্বেষণ চলতে লাগল, কিন্তু তাঁদের সাধ্যমত পণ দিয়ে মনের মত পাত্রী কোথাও যোগাড় করতে পারলেন না। খুঁজে খুঁজে সবাই যখন একরকম হতাশ, তখন গদাধর নিজেই একদিন পাত্রীর সন্ধান দিলেন—'জয়রামবাটী গ্রামে রামচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়ী যাও—তাঁর মেয়েটি আমার জন্য কুটো বাঁধা আছে, তারই সঙ্গে হবে আমার বিয়ে।'

রামেশ্বর সঙ্গীদের নিয়ে চললেন মুখুজ্যেমশায়ের বাড়িতে। ওমা, এ যে একরত্তি মেয়ে; মোটে পাঁচ বছর পার হয়ে ছ'য়ে পড়েছে।

কিন্তু কি আর করা যায়। সুবিধামত পাত্রী যখন পাওয়া যাচ্ছে না, আর গদাই নিজেই যখন এর সন্ধান দিয়েছে, বংশও সৎ বটে, তখন এখানেই সম্বন্ধ ঠিক করা যাক। স্থির হ'ল, বিয়েতে বরপক্ষকে তিনশ' টাকা পণ দিতে হবে।

সন ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসের শেষে শুভদিনে বিয়ে হয়ে গেল। উভয় পক্ষই ছিলেন গরীব, কাজেই বিয়েতে কোনরূপ ঘটা হয় নি। বিয়ের সময় বধূকে দু-চারখানা গহনা পরিয়ে না সাজালে লোকে কি বলবে এই ভেবে চন্দ্রমণিদেবী প্রতিবেশী লাহা বাবুদের বাড়ি থেকে খানকয়েক গয়না ধার করে এনে জয়রামবাটীতে পাঠালেন। কিন্তু ধার করা জিনিস আর কতদিন বা রাখা যায়! তখনকার দিনে বিয়ের পর প্রথম শ্বশুরবাড়িতে এসে নববধূ তো আর বেশি দিন থাকত না। সারদার জয়রামবাটী ফেরার দিন এল। এবার গহনাগুলি খুলে নিয়ে যার জিনিস তাকে ফেরত দিতে হবে। চন্দ্রাদেবী মহাফাঁপরে পড়লেন, বৌ-এর গা থেকে কি করে গহনাগুলি খুলে নেবেন! শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই মায়ের এ দুর্ভাবনা দূর করলেন। বালিকা যখন ঘুমিয়ে, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ অতি সন্তর্পণে গহনাগুলি খুলে নিলেন, বালিকা টেরও পেল না। ঘুম থেকে উঠে বালিকা গহনাগুলির জন্য কেঁদেছিল। 'আমার গদাই তোমাকে আরও ভাল গহনা গড়িয়ে দেবে'—এই বলে চন্দ্রাদেবী কোন রকমে প্রবোধ দিয়েছিলেন। চন্দ্রাদেবীর এই কথা ভবিষ্যতে সফল হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাঁকে শুধু সোনারূপার গহনা গড়িয়ে দিয়েছিলেন তা নয়—এমন সব সুশিক্ষার অলঙ্কারে সাজিয়েছিলেন যা স্বামীর কাছে পাওয়া কদাচিৎ কোন নারীর ভাগ্যে ঘটে থাকে।

বিয়ের পর শ্রীরামকৃষ্ণ এক বৎসর সাত মাস কাল কামারপুকুরে ছিলেন। ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে—সারদাদেবীর

বয়স যখন সাত বৎসর—সেই সময়ে ওদেশের কুলপ্রথা অনুসারে 'জোড়ে' সারদাদেবীকে কামারপুকুরে নিয়ে আসার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ জয়রামবাটীতে গিয়েছিলেন। এর অল্প কিছু দিন পরেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন। সারদাদেবী তার আগেই বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার আগের মত সাধনার সাগরে ডুবে গেলেন। কোথায় রইল তাঁর ঘর বাড়ি মা ভাই, আর কোথায় রইল তাঁর বিয়ে আর স্ত্রী! সারদাদেবীও ছিলেন নেহাৎ কম বয়সের। বিয়ের পর স্বামীর কথা তাঁরও যে তখন খুব মনে পড়ত এমন বোধ হয় না। তিনিও সাংসারিক কাজে আগের মত মায়ের সাহায্য করে দিন কাটাতে লাগলেন।

যে-কালের কথা আমরা বলছি সেকালের মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর দরকারটা বড় কেউ বিশেষ করে ভাবত না। গ্রামে গ্রামে তাদের জন্য স্কুল-পাঠশালাও তখন ছিল না। সারদাদেবী মাঝে মাঝে তাঁর ছোট ভাইদের সঙ্গে পাঠশালায় যেতেন। এর ফলে তাঁর অল্পস্বল্প বর্ণজ্ঞান হয়। পরে একসময়ে কামারপুকুরে এসে একখানা বর্ণপরিচয় সংগ্রহ করেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইঝি লক্ষ্মীদেবীর কাছে পড়তে আরম্ভ করেন। লক্ষ্মী পাঠশালায় গিয়ে পড়ে আসত এবং ঘরে এসে সারদাদেবীকে পড়াত। কিন্তু এভাবে পড়াশুনা বেশি দিন চলল না। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগিনেয় হৃদয় এই বলে একদিন বইখানা কেড়ে নিল,—মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখে কি শেষে নাটক নভেল পড়তে আরম্ভ করবে! ভালরূপে পড়তে শেখার সুযোগ তাঁর হয় দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরে আছেন। সে-সময়ে সারদাদেবীর বিশেষ কাজ ছিল না। ভব মুখুজ্যের এক বিধবা মেয়ে কালীবাড়ির ঘাটে গঙ্গাস্নান করতে

আসতেন। এই মেয়েটি রোজ সারদাদেবীকে পড়িয়ে যেতেন। তিনি বাগান থেকে যে শাকপাতা তরিতরকারী পেতেন তা দিয়ে মেয়েটিকে তুষ্ট করতেন।

সারদাদেবী ছাপানো বই সুন্দররূপে পড়তে পারতেন। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। কিন্তু লেখার কৌশল তিনি কোন দিন আয়ত্ত করেন নি।

পাড়াগাঁয়ের গরীব ও মধ্যবিত্ত ঘরের বালিকারা খুব ছোটবেলা থেকেই নানারকম সাংসারিক কাজে মা-বাপকে যাহায্য করতে বাধ্য হয়। সারদাদেবীকেও তাই দেখি, ছেলেবেলা থেকেই নানারকম সাংসারিক কাজে খুব নিপুণ হয়ে উঠেছেন। মজুরদের জলখাবারের মুড়ি তাঁকে ক্ষেতে বয়ে দিয়ে আসতে হ'ত। কখনও বা মায়ের সঙ্গে নিজেদের ক্ষেত থেকে তুলো তুলে আনতেন ও পৈতা কাটতেন। মাঝে মাঝে বা একগলা জলে নেমে গরুর জন্য জলঘাস কাটতেন। তাঁর মা কোন কারণে রাঁধতে অক্ষম হলে তিনি রাঁধতে বসতেন। কিন্তু তাঁর কোমল কচি হাত দু'টিতে ভাতের হাঁড়ি নামাবার সামর্থ্য ছিল না, তাঁর বাবাকে এই কাজটি ক'রে দিতে হ'ত। এসব ছাড়া কোলে নিয়ে বেড়ানো, খাওয়ানো, কাঁদলে নানা উপায়ে শান্ত করা ইত্যাদি নানা রকমে ছোট ভাইগুলির সেবাযত্নও তাঁকে করতে হ'ত।

ছোটবেলা থেকেই দেখা যেত তাঁর চালচলন ব্যবহার একটু স্বতন্ত্র রকমের—সাধারণ ছেলেমেয়েদের মত নয়। তাঁর বয়সের বালিকাদের মত ছেলেখেলায় তিনি একেবারে মত্ত হয়ে উঠতেন না। তাঁর ব্যবহার ছিল অতি সরল। খেলার সঙ্গিনীদের সঙ্গে তিনি কখনও ঝগড়া করতেন না, বরং সব সময়ে তাদের ঝগড়া মিটিয়ে তাদের মধ্যে ভাব করিয়ে দিতেন। খেলার সময় তিনি বসতেন গিন্নী বা বুড়ী সেজে। তাঁর কতকগুলো খেলার পুতুল ছিল। কিন্তু

পুতুল খেলার চেয়ে কালী বা লক্ষ্মীদেবীর মাটির মূর্তি ফুল-বেলপাতা দিয়ে পূজা করতে তিনি পেতেন বেশি আনন্দ।

আক্ষরিক শিক্ষা অর্থাৎ লিখতে পড়তে শেখাটাই শিক্ষার বড় কথা নয়। যে-শিক্ষা পেলে মানুষ 'মানুষ' বলে গণ্য হ'তে পারে, যে-শিক্ষার ফলে মানুষের চরিত্রে সত্যবাদিতা, সরলতা, দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য, তেজস্বিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ হয়, সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। সেকালে গ্রামে গ্রামে স্কুল পাঠশালা ও ছাপানো বইয়ের ছড়াছড়ি না থাকলেও চরিত্রগঠনের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার অভাব ছিল না। তখন গ্রামে গ্রামে পূজা-পার্বণ মহোৎসব যাত্রা কথকতা পুরাণপাঠ প্রভৃতি প্রায়ই লেগে থাকত। বাড়ি বাড়ি প্রায় প্রতিদিন রামায়ণ মহাভারত পাঠ হ'ত। এইসব থেকে ছেলেবুড়ো স্ত্রী-পুরুষ সকলে চরিত্রগঠনের, সৎভাবে জীবনযাপনের প্রচুর উপাদান খুঁজে পেত। সারদাদেবী তাঁর ছেলেবেলায় এইসব শোনার অনেক সুযোগ পেয়েছিলেন। আর এসকল তাঁর চরিত্রের উপর খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি শুনে শুনে অনেক পৌরাণিক কাহিনী শ্লোক ছড়া প্রভৃতি আয়ত্ত করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে কথাবার্তার মধ্যে এই ছড়া প্রভৃতির আবৃত্তি করে তিনি তাঁর বক্তব্য মধুর করে তুলতেন।

ধর্মভীরু, ঈশ্বরপরায়ণ, দয়ালু মাতাপিতার চরিত্রও তাঁর জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি চিরজীবন তাঁদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতেন। সকলের উপর তিনি তাঁর দেবচরিত্র স্বামীর নিকট শিক্ষালাভের যে অপূর্ব সুযোগ পেয়েছিলেন সে সৌভাগ্য জগতে দুর্লভ।

তৃতীয় অধ্যায়

কামারপুকুরে—পতিসন্নিধানে

আগেই বলেছি, বিয়ের পর সারদাদেবী প্রথম যেবার কামারপুকুরে আসেন তখন তাঁর বয়স ছিল সাত বৎসর মাত্র। সেই অল্প বয়সের বিশেষ কোন কথা তাঁর আর পরে মনে ছিল না। দ্বিতীয়বার কামারপুকুরে আসেন ১৩ বছর বয়সে এবং এক মাস সেখানে বাস করেন। এর ছ মাস পরে তাঁকে আবার কামারপুকুরে নিয়ে যাওয়া হয়; এবার সেখানে ছিলেন দেড় মাস। এই দু'বারেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁর জননী দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন।

তৃতীয়বার কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটী ফিরবার প্রায় চার মাস পরে আবার তাঁকে কামারপুকুরে যেতে হয়। সে ১২৭৪ সালের কথা। দক্ষিণেশ্বরে দীর্ঘকাল সাধনভজনের পর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের গ্রামে এসেছেন। তাঁর সম্বন্ধে দেশের লোকের কৌতূহলের আর অন্ত নেই—কত লোকে কত কথা তাঁর সম্বন্ধে রটনা করেছে। তিনি নাকি পাগল হয়েছেন—মা-কালীর নাম করতে করতে উলঙ্গ হয়ে কাপড় বগলে করে নেচে বেড়ান; কখনও আল্লা বলেন, কখনও হরিনামে মাতোয়ারা হ'ন,—এই রকম আরও কত কথা। কিন্তু তিনি গ্রামে ফিরলে তাঁকে পেয়ে সকলে বিশেষ আনন্দিত হলেন। তাঁর ছেলেবেলায় সকলে তাঁকে যেমন সরল, মিশুক, রগুড়ে, সত্যবাদী ও ভগবানের নামে বিভোর দেখেছিলেন, এখনও তেমনটি দেখলেন। তাঁর আগমনে বাড়িতে আনন্দের হাট বসল; সেই আনন্দের মাত্রা পূর্ণ করবার জন্য পাড়ার মেয়েরা যুক্তি করে সারদাদেবীকে আনাবার ব্যবস্থা করলেন। এ খবর শুনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কোনরূপ সম্মতি বা আপত্তি প্রকাশ করলেন না।

সারদাদেবী কামারপুকুরে এলেন। তাঁর বয়স তখন ১৪ বৎসর; আর শ্রীরামকৃষ্ণ তখন সন্ন্যাসী। তবুও স্ত্রীকে তিনি দূরে সরিয়ে রাখতে চাইলেন না। ভালবেসে সারদাদেবীকে তিনি আপনার করে নিলেন; সারদাদেবীও তাঁকে একমাত্র আশ্রয় মনে করে তাঁর উপর ষোল আনা নির্ভর করতে শিখলেন। তখন আরম্ভ হ'ল শিক্ষাদানের পালা। সাংসারিক সকল খুঁটিনাটি কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করবার যে শিক্ষা সারদাদেবী তাঁর বাল্যকাল থেকে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী স্বামীর নিকট পেলেন, সে কথা ভাবলে অবাক্ হ'তে হয়। ক'জন গৃহস্থই বা নিজের স্ত্রীকে সেরূপ শিক্ষা দিয়ে সকল কাজের উপযুক্ত করে নিতে পারেন! এ বিষয়ে সারদাদেবী পরে নিজমুখে বলেছেন,—"উনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) বলতেন, 'যেখানে যা থাকা উচিত আগে তা ভেবে দেখবে। যে সকল জিনিস প্রায় কাজে লাগে তা রাখবে হাতের ধারে। আর যা সব সময়ে ব্যবহারে লাগে না তা রাখবে দূরে দূরে। কিন্তু যেখানে যেটি রাখবে, কাজ হয়ে গেলে আবার সেইটি ঠিক সেখানেই রাখবে। যেন আঁধারে হাত দিলেও পাও।' কাজ হয়ে যাবার পর যেখানে সেখানে কাটারি, ঝাঁটা, বঁটি, পানের বাটা, থালা, গ্লাস, ঘটি-বাটি ফেলে রাখা উনি মোটেই পছন্দ করতেন না। সংসারের কাজের পক্ষে এ হ'ল ওঁর প্রথম কথা। এর পর তিনি আমায় শলতে পাকাতে, তরকারী কুটতে, পান সাজতে, রান্না করতে কি ভাবে হবে তা পর্যন্ত বলে দিয়েছেন।"

এই সকলের মধ্যেই সাংসারিক শিক্ষা সব শেষ হ'ল না। উপযুক্ত শিক্ষক ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আর তিনি এমন একটি মেয়েকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন যাঁকে ভবিষ্যৎকালে বহু লোকের গুরুর স্থান গ্রহণ করতে হবে। কোন্ বয়সে কোন্ সময়ে কি শিখাতে হবে সে-সব

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাল ভাবেই জানা ছিল। পরে দেখতে পাব, তিনি দক্ষিণেশ্বরে সারদাদেবীকে আরও অনেক সাংসারিক বিষয় শিক্ষা দিচ্ছেন।

কামারপুকুরে সারদাদেবীকে কেবল গৃহস্থালীর কাজকর্ম, দেবতা, গুরু ও অতিথির সেবা, টাকা-পয়সার সদ্‌ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। ভগবান লাভই যে মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং ভগবানের চরণে নিজেকে সমর্পণ ক'রেই যে মানুষকে সকল কাজ সম্পন্ন করতে হবে এ শিক্ষাও সারদাদেবী কামারপুকুরে থাকতেই স্বামীর কাছে পেয়েছিলেন। স্বামীর অদ্ভুত ত্যাগ-বৈরাগ্য এবং ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা দেখে নিজের জীবনও স্বামীর জীবনের মত করে গ'ড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা তাঁর অন্তরে জেগেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায় সাত মাস কাল কামারপুকুরে কাটিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ফিরলেন। শরীরের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে দুর্লভ যে অদ্ভুত ভালবাসা স্বামীর নিকট পেয়ে সারদাদেবীর অন্তর ভরে গিয়েছিল, সেই সম্বল নিয়ে সারদাদেবী জয়রামবাটীতে কাল কাটাতে লাগলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

দক্ষিণেশ্বর দর্শন

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়; একে একে তিন চার বছর কেটে গেল। আশায় বুক বেঁধে সারদাদেবী কাল কাটাচ্ছেন। বিয়ের পর প্রথম দর্শনে যিনি এত ভালবেসেছেন, ইহকালের পরকালের সব রকম উন্নতির জন্য শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি কি আবার তাঁকে নিজের

কাছে ডেকে নিয়ে কৃতার্থ করবেন না? কিন্তু দিনরাত নানা গুজব শুনে শুনে কান যে ঝালাপালা। যার সঙ্গে দেখা হয় সেই যে তাঁর দুর্ভাগ্যে সহানুভূতি প্রকাশ করে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে আসে। শ্রীরামকৃষ্ণ নাকি আবার আগের মত উন্মাদ হয়েছেন, উলঙ্গ বেশে "হরি হরি" করে লম্ফঝম্প করছেন, যেখানে সেখানে যা-তা খাচ্ছেন, আরও কত কি! স্বামীর নিন্দা-মন্দ শোনা এড়াবার জন্য তিনি লোকের বাড়ি যাওয়া ছাড়লেন, লোকের সঙ্গে মেলামেশা ছাড়লেন। মানসিক অশান্তি এড়াবার জন্য দিনরাত নানা সাংসারিক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখলেন। কিন্তু কতদিন বা আর এমন করে কাটে! নিজের চোখে দেখে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে হবে। আর স্বামী যদি সত্যই পাগল হয়ে থাকেন, তবে তাঁর সেবার জন্য আমারও সাধ্যমত কিছু করা উচিত।—এই সব চিন্তা সারদাদেবীকে দক্ষিণেশ্বরে যেতে প্রবৃত্ত করল।

সে ১২৭৮ সালের কথা। দোলপূর্ণিমা তিথিতে গঙ্গাস্নানের জন্য তাঁর কয়েকজন দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া কলকাতায় যাওয়ার উদ্যোগ করলেন। তাঁর ইচ্ছা হ'ল এঁদের সঙ্গে কলকাতায় যাওয়ার। কিন্তু গঙ্গাস্নান তাঁর কাছে বড় কথা নয়, স্বামীকে দর্শনের জন্য তাঁর প্রাণ তখন ব্যাকুল। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কন্যার আসল ইচ্ছা বুঝতে পারলেন এবং নিজেই সারদাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

তখন জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় আসার কোন ভাল রাস্তা ছিল না, রাস্তায় কোনরূপ গাড়িঘোড়াও পাওয়া যেত না। এক পালকিতে আসা চলত, কিন্তু শ্রীযুত রামচন্দ্রের মত গরীবের পক্ষে এই দূরপথের জন্য তার ভাড়া যোগাড় করা একরকম অসাধ্য ছিল। কাজেই তাঁরা সকলে পায়ে হেঁটে যাত্রা করলেন। প্রথম দু'দিন বেশ

আনন্দে কাটল। কিন্তু সারদাদেবীর ত দূরপথ চলার অভ্যাস ছিল না; তৃতীয়দিনে তিনি দারুণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন। পিতা বাধ্য হয়ে কন্যাকে নিয়ে পথের পাশের এক চটিতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। পরদিন সকালে যখন জ্বর ছেড়ে গেল তখন তাঁরা একটু একটু করে এগিয়ে যাওয়াই উচিত বিবেচনা করলেন। সৌভাগ্যক্রমে অল্প রাস্তা যেতে না যেতেই একটা পালকি পাওয়া গেল। কিছু সময় পরে পালকি চ'ড়ে যাবার সময় সেদিন আবার জ্বর এসেছিল, কিন্তু প্রথম দিনের মত জোরে নয়। সারদাদেবী জ্বরের কথা কাউকে বললেন না। ক্রমে দিনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পথের কষ্টেরও অবসান হয়ে এল। নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে তাঁরা প্রায় রাত ন'টার সময় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পৌঁছুলেন।

না বলে-কয়ে রাতের বেলা যুবতী স্ত্রীকে নিজের কাছে উপস্থিত হ'তে দেখে পাগল সন্ন্যাসী কি করলেন? সে কথা সারদাদেবীর নিজের মুখে শুনতেই লাগবে ভাল।—"আমি একেবারেই ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণের) ঘরে গিয়ে উপস্থিত। এঁরা সব (সঙ্গীরা) নবতের ঘরে-টরে গিয়েছেন (যেখানে ঠাকুরের মা ছিলেন)। ঠাকুর দেখে বললেন, 'তুমি এসেছ, বেশ করেছ।' বললেন, 'মাদুর পেতে দে রে।' ঘরেই মাদুর পেতে দিলে। ঠাকুর বললেন, 'এখন কি আর আমার সেজবাবু (রাণী রাসমণির জামাই ৺মথুরানাথ বিশ্বাস) আছে? আমার ডান হাত ভেঙে গেছে।' তখন কয়েক মাস হয় মথুরবাবু মারা গেছেন।....আমরা নবতের ঘরে যেতে চাইলুম। ঠাকুর বললেন, 'না না, ওখানে ডাক্তার দেখাতে অসুবিধা হবে। এ ঘরেই থাক।' আমরা তাঁর ঘরেই শুলুম। একটি সঙ্গী মেয়ে আমার কাছে শুল।....পরদিন ডাক্তার দেখালেন। কয়েকদিন পরে জ্বর সারতে নবতের ঘরে গেলুম।"

উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ফলে সারদাদেবী কয়েক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু দেহের রোগ সারা তাঁর কাছে আজ বড় কথা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের চালচলন এবং তাঁর প্রতি গভীর ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার দেখে তিনি যে কিরূপ আনন্দিত হ'লেন, সে কথা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। উঃ, এই দীর্ঘ চার বছর সময় তিনি কী অশান্তিতেই না কাল কাটিয়েছেন! গ্রামের অজ্ঞ লোকেরা নানা বাজে কথা রটনা করে তাঁর প্রাণে কী কষ্টই না দিয়েছে! কিন্তু এখন নিজের চোখে দেখে বুঝলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পাগলও হন্ নি এবং তাঁকেও ভোলেন নি। সুতরাং নিজের কর্তব্য স্থির করতে তাঁর আর বিলম্ব হ'ল না। তিনি স্থির করলেন, জয়রামবাটীতে আর ফিরবেন না; আত্মভোলা, দিবানিশি ভগবানের নামে মাতোয়ারা সন্ন্যাসী স্বামীর এবং তাঁর জননী চন্দ্রমণিদেবীর সেবায় দক্ষিণেশ্বরে কাল কাটাবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

সন্ন্যাসীর পরীক্ষা

কঠোর তপস্বী বলতে সাধারণতঃ আমরা যেমনটি বুঝি, শ্রীরামকৃষ্ণ যদি সেই ধরনের তপস্বী হতেন তা'হলে তিনি সারদাদেবীর মুখের দিকেও চাইতেন না—আসার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করে দিতেন। আর মনের জোর যদি তাঁর তেমন না থাকত তাহ'লে সাধনভজন সব ছেড়ে সংসারে জড়িয়ে পড়তেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তো সাধারণ মানুষ ছিলেন না। কাজেই, এই দুই সম্ভাবনার কোনটাই তাঁর পক্ষে খাটল না।

সারদাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে আসার কয়েক দিন পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "কিগো, তুমি আমাকে সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?" তাতে তিনি উত্তর দিলেন, "না, আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।" এই এক কথা থেকে বুঝতে পারি, কয়েক বছর আগে কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সাধনভজন ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ সম্বন্ধে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, সে শিক্ষা বৃথা যায় নি; এই কয় বৎসরের নীরব সাধনায় তিনি স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিণী হয়ে গ'ড়ে উঠেছিলেন।

সারদাদেবীর ঐরূপ উত্তর শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্বস্ত হলেন। তিনি একসময় জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেম, 'মা, আমার স্ত্রীর মন একেবারে পবিত্র করে দে।' এখন বুঝলেন, জগন্মাতা তাঁর সে প্রার্থনা পূরণ করেছেন।

যাঁর যথার্থ জ্ঞান হয়েছে তিনি সব সময়ে দেখেন, জগতের সকল স্থানে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে একই আত্মা বিদ্যমান রয়েছেন। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোন ভেদজ্ঞান তাঁর আর থাকে না। এ সংসারে প্রলোভনের, মনের চাঞ্চল্য জন্মাবার মত কোন বস্তু আর তিনি দেখতে পান না। কাজেই, কিছুতেই আর তাঁর মনের শান্তি নষ্ট হয় না। এইসব কথা অনেকদিন আগে সন্ন্যাস নেবার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গুরু তোতাপুরীর মুখে শুনেছিলেন। গুরু নিজে উপযাচক হয়ে তাঁকে সন্ন্যাস দেবার ইচ্ছা করলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন যে তাঁর বিয়ে হয়েছে ও স্ত্রী জীবিত আছে। গুরু উত্তর দেন, "তাতে কি আসে যায়! স্ত্রী কাছে উপস্থিত থাকলেও যাঁর ত্যাগ-বিবেক-বৈরাগ্যের একটুও হানি হয় না, যাঁর মন একটুও চঞ্চল হয় না, সেই ব্যক্তিই তো ঠিক ঠিক জ্ঞানী, তাঁরই যথার্থ ব্রহ্মদর্শন হয়েছে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে

যতক্ষণ ভেদজ্ঞান থাকে ততক্ষণ সাধকের ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।” শ্রীরামকৃষ্ণ যুবতী স্ত্রীকে নিজের কাছে রেখে দেখতে চাইলেন, তাঁর যথার্থ জ্ঞান হয়েছে কিনা, এই দীর্ঘকালের সাধনা তাঁর সিদ্ধ হয়েছে কিনা।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ছিল এক দারুণ রোক। যখন যে কাজ ধরতেন সেটা ভালভাবে শেষ না করে কিছুতেই ছাড়তেন না। ঐ সব কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্ত্রীকে ইচ্ছামত তাঁকে সেবা করার অধিকার দিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে সাত-আট মাসকাল রাতের বেলা নিজের সঙ্গে এক বিছানায় শুতেও দিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মন আর কিছুতেই সংসারের জালে জড়িয়ে পড়বার নয়। সারারাত তাঁর মন সমাধিতে ডুবে ভগবানের ভাবে বিভোর হয়ে থাকত; মাঝে মাঝে সাধারণ বিষয়ে হুঁশ ফিরে এলেও সাধারণ মানুষের মত তাঁর মন কিছুতেই দেহের ভোগের দিকে আকৃষ্ট হ'ত না।

এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বিছানার পাশে সারদাদেবীর রাতগুলি কেমন করে কাটত, সে কথা তাঁর নিজের ভাষাতেই শুনি। “সে যে কী অপূর্ব দিব্যভাবে (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) থাকতেন তা বলে বোঝাবার নয়। কখনো ভাবের ঘোরে কত কি কথা বলেন; কখনও হাসি, কখনও কান্না, কখনো সমাধিতে একেবারে স্থির হয়ে যাওয়া—এই রকম সমস্ত রাত! সে কী এক আবির্ভাব, কী এক আবেশ! দেখে ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঁপত, আর ভাবতুম, কখন রাত পোহাবে। ভাবসমাধির কথা তখন ত কিছু বুঝি না। একদিন তাঁর সমাধি আর ভাঙে না দেখে ভয়ে কেঁদেকেটে ঝিকে দিয়ে হৃদয়কে ডেকে পাঠালুম। সে এসে কানে নাম শোনাতে শোনাতে তবে কতক্ষণ পরে তাঁর চৈতন্য হয়। তারপর ঐরূপে ভয়ে কষ্ট পাই দেখে তিনি নিজে শিখিয়ে

দিলেন—এই রকম ভাব দেখলে এই নাম (কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতির) শোনাবে, এই রকম ভাব দেখলে এই 'বীজ' (মন্ত্র) শোনাবে। তখন আর তত ভয় হ'ত না। ঐ সব শোনালেই তাঁর আবার হুঁশ হ'ত। ঠাকুর বীজ ও নাম বলে দিলেও কখন যে তাঁর ভাব হবে, সমাধি হবে —এই ভেবে ভয়ে আর ঘুমুতে পারি নি, একথা একদিন জানতে পেরে আমায় নবতে শাশুড়ীর কাছে শুতে বললেন।" শ্রীরামকৃষ্ণের জননী চন্দ্রমণি তখন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরসংলগ্ন নহবতের ঘরে বাস করতেন।

স্বামীর কাছে এসে সারদাদেবী পেলেন তাঁর প্রাণভরা ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। একসঙ্গে তেমনটি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা কোনকালে কোন স্ত্রীলোকের ভাগ্যে জুটেছে বা আর কখনও জুটবে কিনা সন্দেহ। একদিন রাতের বেলা স্বামীর পা টিপে দিতে দিতে তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, "আমাকে তোমার কি মনে হয়?" সঙ্গে সঙ্গে সহজভাবে উত্তর এল, "যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও সম্প্রতি নবতে বাস করছেন আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন।" সাধনার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের এমনই হয়েছিল শুদ্ধ দৃষ্টি।

আর একথাও ঠিক যে, সারদাদেবীর জীবনও অতি শুদ্ধ এবং সকল রকমে দেহের ভোগসুখের ইচ্ছা থেকে মুক্ত ছিল বলেই শ্রীরামকৃষ্ণ কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন। সারদাদেবীর চরিত্রের মহত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ মুখে বলেছেন, "ও যদি এত ভাল না হ'ত, তাহ'লে আমার সংসারের সুখভোগের ইচ্ছা হ'ত কিনা কে বলতে পারে!"

ষষ্ঠ অধ্যায়

ষোড়শী পূজা

দেখতে দেখতে আড়াই মাস সময় কেটে গেল। সারদাদেবী প্রাণভরে দিনরাত স্বামীর সেবা করছেন এবং তাঁর উপদেশ মত সাধনভজনে কাল কাটাচ্ছেন।

স্ত্রী নিত্য সঙ্গে থাকলেও শ্রীরামকৃষ্ণ যেমনটি ছিলেন তেমনই রইলেন। আগে যেমন সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে জগৎজননী কালীকেই দেখতেন এখনও তেমন দেখতে লাগলেন,—মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভবতারিণীই সারদাদেবীর মূর্তি ধরে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন। আবার কখনও বা দেখেন, এক ব্রহ্ম সকল প্রাণীতে যেমন, সারদাদেবীতেও তেমন প্রকাশ পাচ্ছেন। সারদাদেবীর মধ্যে তিনি আত্মাকেই দেখতে লাগলেন—তিনি যে রক্তেমাংসে গড়া স্ত্রীলোক, এ চিন্তা তাঁর মনেই ওঠে না। তিনি বুঝলেন, তাঁর সাধনা সিদ্ধ হয়েছে ; তাঁর জ্ঞানের আর নড়চড় হবার নয়। এখন নতুন এক পূজা করে তিনি চিরজীবনের মত সাধনভজনের শেষ করতে চাইলেন।

সন ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস, অমাবস্যা তিথি। এই দিনে ফলহারিণী কালীপূজা হয়। তাই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আজ দেবীর পূজার বিশেষ ব্যবস্থা। বাইরে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে সব ঢেকে রয়েছে। মন্দিরের উঠান আলোয় আলোকময়—লোকজনের কথাবার্তায় ভজনে কীর্তনে মুখরিত। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে আজ দেবীর বিশেষ পূজার আয়োজন করেছেন,—কিন্তু মন্দিরে নয়, নিজের ঘরে। মন্দিরের একজন পূজারী ফুল বেলপাতা এনে দিলেন, তাঁর ভাগ্নে হৃদয় পূজার আর সব যোগাড়যন্ত্র করে দিয়ে সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে

রেখে কালীমন্দিরে পূজা করতে চলে গেলেন। এই সব করতে রাত প্রায় ৯টা বাজল। সারদাদেবীকে তাঁর ঘরে আসবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ আগেই খবর দিয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি এলে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঘরের মধ্যে রইলেন তাঁরা দু'জন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পূজায় বসলেন। আচমন, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি ইত্যাদি পূজার প্রথমকার অনুষ্ঠান সব সারতে কিছু সময় লাগল। পূজা দেখতে দেখতে সারদাদেবীর বাইরের বিষয়ের হুঁশ কমে আসতে লাগল। শ্রীরামকৃষ্ণ বসে ছিলেন পূর্বমুখী হয়ে, তাঁর সামনে দেবীর জন্য আলপনা দেওয়া একটা পিঁড়ি পাতা ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ইশারা করে সারদাদেবীকে ঐ পিঁড়িতে বসতে বললেন। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত সঙ্গে সঙ্গে ঐ পিঁড়িতে গিয়ে বসলেন পশ্চিমমুখী হয়ে।

প্রতিমাতে লোকে যেমন ভাবে পূজা করে থাকে, শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে ঠিক সেইভাবে ষোড়শ উপচারে পূজা করতে লাগলেন। মন্ত্র পড়ে পবিত্র-করা জল বার বার তাঁর উপর ছিটিয়ে দিয়ে তাঁর অভিষেক করলেন। তাঁর শরীরে দেবীর আবির্ভাবের জন্য এইরূপ মন্ত্র পড়ে প্রার্থনা জানালেন। "হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী জননী ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর। ইঁহার শরীর-মনকে পবিত্র করিয়া ইঁহাতে আবির্ভূত হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।" তারপর যেমনভাবে পূজা করতে হয় পূজা চলল। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবীর পায়ে আলতা ও কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিলেন, নূতন কাপড় পরালেন, পায়ে ফুল দিয়ে পূজা করলেন, মুখে মিষ্টি ও পান দিলেন। সারদাদেবী স্বভাবতঃ ছিলেন খুব লাজুক; কিন্তু তখন তিনি এমন ভাবে বিভোর যে সব পূজা গ্রহণ করলেন, কোন সঙ্কোচ বা আপত্তি প্রকাশ করলেন না। পূজার শেষে তিনি গভীর সমাধিতে ডুবে গেলেন, শ্রীরামকৃষ্ণেরও বাহ্যচেতনা একেবারে চলে গেল।

কতক্ষণ এইভাবে কেটে গেল। রাতের তৃতীয় প্রহরে শ্রীরামকৃষ্ণের হুঁশ কিছু ফিরে এল। তখন তিনি নিজের সাধনকালে যে সব জিনিস ব্যবহার করে এসেছেন, সে সব জিনিস, নিজের জপের মালা প্রভৃতি—দেবীর পায়ে সমর্পণ করলেন। আর সেই সঙ্গে দেবীর পায়ে উৎসর্গ করলেন নিজের সাধনার সকল ফলের সঙ্গে নিজেকেও। পূজার শেষে সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করলেন,—

সর্বমঙ্গসমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

শ্রীরামকৃষ্ণের সকল পূজার, সকল সাধনার আজ শেষ হ'ল।

পূজা শেষে সারদাদেবীরও সমাধি ভঙ্গ হ'ল। তিনি মনে মনে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করে নহবতে চলে গেলেন। এই পূজাকে বলে যোড়শী পূজা বা রাজরাজেশ্বরী পূজা। এই পূজায় এক নবযুবতী মেয়েকে দেবীজ্ঞানে পূজা করতে হয়। যুবতীর বয়স যে ঠিক ষোল বছর হতে হবে এমন কথা নাই। এই পূজার সময় সারদাদেবীর বয়স আঠার বছরের কিছু বেশি হয়েছিল।

সপ্তম অধ্যায়

শিক্ষা ও সাধনা

কয়েক বৎসর আগে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কামারপুকুরে যান, তখন তিনি সারদাদেবীকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তখন তিনি বয়সে বালিকা ছিলেন—সব কিছু জানবার ও বুঝবার মত সামর্থ্য তখনও তাঁর হয় নি। আর শ্রীরামকৃষ্ণও খুব বেশি দিন কামারপুকুরে থেকে তাঁর এই কাজ শেষ করে আসতে পারেন নি। এখন সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে আসায় তিনি তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করতে মনস্থ করলেন।

সাংসারিক জ্ঞানের অনেক কথা সারদাদেবী কামারপুকুরে শিখেছিলেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে আরও অনেক কিছু জানা দরকার। নতুন জায়গা—বয়স বেড়েছে—নানারকম স্বভাবের অনেক অজানা লোকের সঙ্গে মিশতে হচ্ছে। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে দরকার মত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। এ বিষয়ে সারদাদেবী বলছেন,—"দক্ষিণেশ্বরে এলাম। তখন থেকে আরম্ভ হ'ল নৌকা ও গাড়িতে যাতায়াত। তাই উনি বলেছিলেন, 'নৌকা ও গাড়িতে সকলের আগে উঠবে, দেখে নেবে সব জিনিসপত্র উঠল কিনা। নাববার সময়ে কিন্তু নাববে সকলের শেষে। দেখে নাববে, যেন কিছু গাড়ি বা নৌকায় থেকে না যায়'।"

"এই সময় থেকে নানা রকম মেয়ে ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্তা হ'ত। তাই না দেখে তিনি একদিন বলেছিলেন, 'যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন—বুঝে চলতে পারলেই হ'ল।' তারপর বলেছিলেন,—'হাড়-মাংসের খাঁচা, বাইরে থেকে দেখতে সব মানুষই একরকম দেখায়। কিন্তু মন ত সবার সমান হয় না।' তাই তিনি আমাকে লক্ষ্মী, মেয়ে যোগেন, গোলাপ, গোপালের মা, বলরামবাবুর স্ত্রী, বাবুরামের মা—এই যারা তাঁর আপনার লোক, তাদের সঙ্গে সব সময় মেলামেশা করতে বলতেন। কোন কোন মেয়ের সাথে যত কম কথা বলতে পারি শিখিয়ে দিতেন। আবার কারুর সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করতেন।...."

"কিসে ভাল থাকব, তাই করেছেন। তিনি বলতেন, 'কর্ম করতে হয়। মেয়েলোকের বসে থাকতে নেই, বসে থাকলে নানা রকম বাজে চিন্তা, কুচিন্তা সব আসে।' একদিন কতকগুলি পাট এনে আমায় দিয়ে বললেন, 'এইগুলো দিয়ে আমাকে শিকে পাকিয়ে দাও;

সন্দেশ রাখব, লুচি রাখব ছেলেদের জন্যে।' আমি শিকে পাকিয়ে দিলুম, আর ফেঁসোগুলো দিয়ে থান ফেড়ে বালিশ করলুম। চটের উপর পটপটে মাদুর পাততুম আর সেই ফেঁসোর বালিশ মাথায় দিতুম। তখনও তাইতে শুয়ে যেমন ঘুম হ'ত এখনও এইসবে (খাট-বিছানায়) শুয়ে তেমনই ঘুমোই—কোন তফাৎ বোধ হয় না, মা।"

সংসারে যেমন ভাবে চললে লোকে নিজে সুখী হ'তে ও অপরকে সুখী করতে পারে, সেই রকমের কত শিক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে দিলেন। জগতের কল্যাণের জন্য ভবিষ্যতে তাঁকে শত শত লোকের সংস্রবে আসতে হবে। তাই সাধনভজন, ভগবান লাভের উপায় প্রভৃতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এসব শিক্ষার প্রয়োজনও যে তাঁর পক্ষে বড় কম ছিল না।

সাধনভজন সম্বন্ধে কত রকমের শিক্ষাই না সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন উত্তম গুরু। শুধু উপদেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকতেন না—শিষ্য উপদেশ মত কাজ করে কিনা তাও তিনি দেখে নিতেন।

ভালবাসাতেই মানুষ আপন হয়। যে ভালবাসে তার উপদেশ শুনতে তার কথা মত চলতে আপনা থেকেই ইচ্ছা যায়। স্বামীর ভালবাসার পরিচয় সারদাদেবী কামারপুকুরে যথেষ্ট পেয়েছিলেন। এখন আবার রুগ্ন শরীরে দক্ষিণেশ্বরে এসে যে স্নেহ-প্রীতির নিদর্শন পেলেন তাতে তাঁর মন স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিতে পূর্ণ হয়ে গেল। সকল রকমে তিনি স্বামীর আদেশ পালন করতে, তাঁর উপদেশ অনুযায়ী নিজের জীবন গড়ে তুলতে প্রস্তুত হলেন।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, 'চাঁদ-মামা যেমন সকল ছেলেরই মামা, তেমনই ঈশ্বর সকলেরই আপনার; তাঁকে ডাকার অধিকার আছে সকলেরই। যে তাঁকে ডাকবে তাকেই তিনি দেখা

দিয়ে কৃতার্থ করবেন। তুমি ডাক ত তুমিও দেখা পাবে।' এই রকম সব শিক্ষা দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজের জীবনের বৈশিষ্ট্য ত্যাগ-বৈরাগ্য, ঈশ্বরে অনুরাগ প্রভৃতি গুণ যাতে সারদাদেবীর জীবনেও ফুটে ওঠে সে চেষ্টা সর্বদা করতে লাগলেন।

সারদাদেবীর মন ছিল অতি নির্মল, কামনা-বাসনার লেশমাত্র তাতে ছিল না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ যেমনটি শোনা তেমনটি তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনের কাজে লাগাতে লাগলেন। দক্ষিণেশ্বরের সাধনভজনের মধ্যে তাঁর দিনগুলো কেমন সুন্দরভাবে কাটত সে কথা এখন আমরা তাঁর নিজের মুখেই শুনি, "দক্ষিণেশ্বরে রাত তিনটের সময় উঠে জপে বসতুম*। কোন হুঁশ থাকত না। একদিন জোছনা রাতে নবতে সিঁড়ির পাশে বসে জপ করছি, চারিদিক নিস্তব্ধ। ঠাকুর সেদিন কখন ঝাউতলায় শৌচে গেছেন, কিছুই জানতে পারি নি—অন্য দিন জুতোর শব্দে টের পাই। খুব ধ্যান জমে গেছে। (তখন আমার অন্য রকম চেহারা ছিল—গয়না পরা, লালপেড়ে শাড়ী) গা থেকে আঁচল খসে বাতাসে উড়ে উড়ে পড়ছে, কোন হুঁশ নেই। ছেলে যোগেন (স্বামী যোগানন্দ) সেদিন ঠাকুরের গাড়ু দিতে এসে আমাকে ঐ অবস্থায় দেখেছিল। সেসব কি দিনই গেছে মা! জোছনা রাতে চাঁদের পানে তাকিয়ে জোড় হাত করে বলেছি, তোমার ঐ জোছনার মত আমার অন্তর নির্মল করে দাও।" "যখন নবতে থাকতুম, রাতে যখন চাঁদ উঠত, গঙ্গার স্থির জলে চাঁদ দেখে ভগবানের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতুম, চাঁদেতেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।".

---

* সারদাদেবী নহবত ঘরে নিচের কুঠরিতে থাকতেন এবং উহার পশ্চিমের বারান্দার সিঁড়িরপাশে গঙ্গার দিকে দক্ষিণমুখে বসে ধ্যান করতেন।

"জপ ধ্যান করতে করতে দেখবে, উনি (ঈশ্বর) কথা কবেন, মনে যখন যে বাসনাটি উঠবে তক্ষুনি পূর্ণ করে দেবেন—কী শান্তি প্রাণে আসবে! আহা, তখন কি মনই ছিল আমার।....সাধন করতে করতে দেখবে আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে বাগদি ডোমের মাঝেও তিনি—তবে ত মনে দীনভাব আসবে।"

শুধু ধ্যান করতে বসে নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের কথা শুনতে শুনতে তিনি এক-একদিন এমন তন্ময় হয়ে যেতেন যে তাঁর নিজের শরীরের বা সময়ের জ্ঞান থাকত না। একদিন রাতে সারদাদেবী এক ভক্ত মহিলার সঙ্গে রামকৃষ্ণের ঘরে খাবার দিতে এসেছেন। তাঁর মুখ ঘোমটায় ঢাকা। তিনি ছিলেন অতিশয় লজ্জাশীলা—শ্রীরামকৃষ্ণের সামনেও তিনি ঘোমটা দিয়ে থাকতেন। আহারের শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বর ও সাধনভজনের প্রসঙ্গ আরম্ভ করে একেবারে মেতে উঠলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিচ্ছেদে বলে চলেছেন—সময়ের আর জ্ঞান নাই। সারদাদেবী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশরূপ অমৃতপানে তিনি এমন বিভোর যে আহার, বিশ্রাম নিদ্রা, ইত্যাদির কোন চিন্তা আর তাঁর মনে এল না—মাথা থেকে ঘোমটা কখন একেবারে খসে গেছে তার খেয়াল নাই। রাত্রি যখন শেষ হয় হয়, উষার অরুণরাগ পূব আকাশ রঞ্জিত করে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়েছে, তখন তাঁর বাহ্যচেতনা ফিরে এল। তিনি ঘোমটা টেনে তাড়াতাড়ি নহবতের ঘরে চলে গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা দেওয়ার ধরনই ছিল এক নূতন রকমের। তার আর একটা দৃষ্টান্ত। একদিন নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। তাঁর মুখের গান ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অতি প্রিয়—শুনলেই প্রায় ভগবানের ভাবে ডুবে যেতেন। সেদিন

নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের সামনে বসে তানপুরা নিয়ে গাইতে লাগলেন,—

নাথ! তুমি সর্বস্ব আমার।
প্রাণাধার সারাৎসার,
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে।
বলিবার আপনার।
তুমি ইহকাল তুমি পরিত্রাণ,
তুমি পরকাল তুমি স্বর্গধাম,
তুমি শাস্ত্রবিধি তুমি কল্পতরু,
অনন্ত সুখের আধার।
তুমি হে উপায় তুমি হে উদ্দেশ্য,
তুমি স্রষ্টা পাতা তুমি হে উপাস্য,
দণ্ডদাতা পিতা স্নেহময়ী মাতা,
ভবার্ণবে কর্ণধার।

গান আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সমাধিস্থ। নহবতে সারদাদেবীও হলেন ভাবাবিষ্ট। গান থামল, কিন্তু সুরের রেশ যেন কালীবাড়ি মাতিয়ে তুলল। বেলাশেষে সকলে এদিক ওদিক পায়চারি করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নহবতের ধারে এসে সারদাদেবীকে ডেকে বললেন, "নরেন যে গাইছিল—'নাথ, তুমি সর্বস্ব আমার' এই গানটার উপরে তুমি দিন কতক ধ্যান করবে।"

সারদাদেবী কত রকম সাধনভজন শিখেছিলেন তা সব জানা যায় না। নিজের কথা তিনি খুব কম বলতেন। যোগাভ্যাস করতে যে শিখেছিলেন, এটা ঠিক। একদিন কথার মাঝে তিনি বলেছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জন্য কুণ্ডলিনীর ও ষট্‌চক্রের ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। ভজন কীর্তন স্তব প্রভৃতিও অনেক তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের

নিকট শিক্ষা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের যতদিন শরীর ছিল সেই সময়ের মধ্যে সাতবার তিনি জয়রামবাটী বা কামারপুকুর থেকে এসে দক্ষিণেশ্বরে বাস করেন। এইসব সময়েই তিনি কিছু-না-কিছু শিক্ষালাভ করেছেন।

সাধনভজনের ফলে মানুষের কি হয়, সে বিষয়ে সারদাদেবী যা বলেছেন, সে কথাটি মনে রাখবার মতো—"ভগবান লাভ হ'লে কি আর হয়? ছটো কি শিং বেরোয়? না; সদ্‌সৎ বিচার আসে, জ্ঞান-চৈতন্য হয়, জন্মমৃত্যু তরে যায়।"

সাধনভজনের ফল তাঁর জীবনে যে কি ভাবে ফলেছিল, তা আমরা পরে দেখতে পাব তাঁর সারাজীবনের আচরণ আলোচনা করে।

অষ্টম অধ্যায়

জয়রামবাটী ও কামারপুকুরে যাতায়াত

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিতকালের মধ্যে সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে বাস করেন মোট তের বৎসর। কিন্তু একটানা থাকতে পারেন নি, নানা কারণে তাঁকে মাঝে মাঝে জয়রামবাটী ও কামারপুকুরে যাতায়াত করতে হয়েছে। এই যাতায়াতকালে পথে যে সব ঘটনা ঘটেছিল তার কিছু কিছু এখানে বলছি। প্রসঙ্গক্রমে দক্ষিণেশ্বরের দু-এক কথাও বলা যাবে।

প্রথমবারে দক্ষিণেশ্বরে এসে দেড় বছরের কিছু বেশি সময় ছিলেন। ১২৮০ সালের আশ্বিন বা কার্তিক মাসে তিনি কামারপুকুর হয়ে জয়রামবাটীতে ফেরেন। ঐ বৎসর চৈত্র মাসে রামনবমী তিথিতে তাঁর পিতার দেহত্যাগ হয়। পিতার মৃত্যুর মাসখানেক

পরে ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে তিনি আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যান এবং শাশুড়ী চন্দ্রমণিদেবীর সঙ্গে নহবত ঘরে বাস করতে থাকেন।

যাঁরা দক্ষিণেশ্বর গিয়েছেন তাঁরা সবাই জানেন, সেখানকার নহবতের ঘর কত ছোট। তার নিচের ঘরে একজনের বাস করাও কষ্টকর নয় কি? আর শুধু থাকা ত নয়, রান্নাবান্নার সমস্ত জিনিসপত্র সেই ঘরে রাখতে হবে। কোন ভক্ত মেয়ে এলে তাকেও শোবার একটু স্থান দিতে হবে। ঘরে সিঁড়ির নীচে তাঁকে রাঁধতে হ'ত। আবরু রক্ষার জন্য সেই ছোট ঘরের আরও ছোট বারান্দাকে দরমা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল। তার ফলে ঘরে আলোবাতাসকে যেন ঢুকতে বারণ করা হয়েছিল।

সে ঘরের বর্ণনা সারদাদেবীর নিজের মুখেই শোনা যাক্।—"ঐ ঘরটুকুর মধ্যেই সব সংসার ছিল,—মায় ঠাকুরের জন্য হাঁড়িতে করে মাছ জীয়ান পর্যন্ত। প্রথম প্রথম ঘরে ঢুকতে মাথা ঠুকে যেত। একদিন কেটেই গেল। শেষে অভ্যাস হয়ে গিছল। দরজার সামনে গেলেই মাথা নুয়ে আসত। কলকাতা থেকে সব মোটামোটা মেয়েলোকেরা দেখতে যেত, আর দরজার দু'দিকে হাত দিয়ে বলত, 'আহা, কি ঘরেই আমাদের সতীলক্ষ্মী আছেন গো,—যেন বনবাস গো'!"

মন্দিরের কাছাকাছি তাঁর থাকার উপযুক্ত সুবিধামত আর কোন ঘরও ছিল না। এই রকম কষ্ট দেখে তাঁর দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আসার পর শ্রীরামকৃষ্ণের দু'জন অনুরাগী ভক্ত মিলে কালীবাড়ির বাগানের বাইরে একটা বড় খড়ের ঘর তৈরী করে দিলেন। এই ঘরে তিনি প্রায় এক বৎসরকাল বাস করেন। এখানে রান্না করে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে খাবার দিতে যেতেন। এই ঘরে বাসের সময় তাঁর কঠিন আমাশয় রোগ হয় এবং জলবায়ুর পরিবর্তনে শীঘ্র

শরীর সারবে ভেবে তিনি ১২৮২ সালের আশ্বিন মাসে জয়রামবাটী যান।

তৃতীয়বার তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেন ১২৮৩ সালের শীতকালে। এসে সেই খড়ের ঘরে বাস করতে থাকেন। কিন্তু বেশি দিন তাঁকে সেই ঘরে বাস করতে হয় নি। শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর অসুস্থ হওয়ায় তাঁর সেবার জন্য সারদাদেবীকে নহবতের ঘরে চলে আসতে হয়। তখন থেকে দক্ষিণেশ্বরে যতদিন ছিলেন, ঐ ঘরেই বাস করেছেন। সঠিক বলা মুশকিল; তবে মনে হয়, এই তৃতীয়বারেই দক্ষিণেশ্বরে আসার বেলা পথে এমন এক ঘটনা ঘটেছিল, যা থেকে তাঁর সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি এবং আরও অনেক গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রামের কয়েকজন প্রাচীনা গঙ্গাস্নানে আসছিলেন। সারদাদেবী তাঁদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে আসা স্থির করলেন। গ্রাম থেকে যাত্রা করে দু'ক্রোশ পথ হেঁটে কামারপুকুরে পৌঁছুলেন। সেখান থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইঝি লক্ষ্মী ও ভাইপো শিবরাম তাঁর সঙ্গে আসবেন, আগে থেকে কথা ছিল। সকলে মিলে আবার চার ক্রোশ হেঁটে আরামবাগে উপস্থিত হলেন। প্রথমে সকলে স্থির করেছিলেন আরামবাগেই রাত কাটাবেন। কিন্তু আরামবাগে যখন পৌঁছুলেন তখন দেখা গেল, অনেক বেলা আছে।

শুধু শুধু বসে সময় কাটিয়ে কি লাভ! যতটা এগিয়ে থাকা যায় ততই ভাল। চল, তারকেশ্বরে গিয়ে রাত কাটানো যাক। আর পাঁচ ক্রোশ বই তো নয়!—এই হ'ল অধিকাংশ যাত্রীর মত। তাই একটু বিশ্রাম করে আবার সকলে পথে বেরিয়ে পড়লেন। কোন কাজে অপরের অসুবিধার সৃষ্টি করা বা কারও ভারস্বরূপ হওয়া সারদাদেবীর ধাতে একেবারে সইত না। তাই নিজের কষ্ট হবে বুঝেও মুখে কিছু বললেন না। কিন্তু তাঁর বেশি পথ চলার তো

অভ্যাস ছিল না। অর্ধেক পথ কোন রকমে সঙ্গীদের সঙ্গে সমান তালে চললেন। কিন্তু আর পারেন না। কেবল পিছিয়ে পড়ছেন। সঙ্গীরা দু'বার থেমে তাঁর জন্য অপেক্ষা করলেন, এবং তাঁকে তাগিদ দিতে লাগলেন তাড়াতাড়ি চলবার জন্য। বেলা শেষ হয়ে আসছে, সবার ভয়ও পাচ্ছে। তাঁদের তেলোভেলো ও কৈকালার মস্ত বড় মাঠ পার হ'তে হবে। আশেপাশে লোক নেই, জন নেই, খোলা মাঠ ধুধু করছে। তার মাঝে একটা পথ প্রকাণ্ড অজগর সাপের মত আছে শুয়ে। পথে ডাকাতের দারুণ উৎপাত। তাদের হাতে পড়ে সকলের শেষে ধনেপ্রাণে মারা যেতে হবে নাকি। তাঁর জন্য সবাই বিপদে পড়ুক, একথা তিনি ভাবতে পারেন না। সঙ্গীদের বললেন, তোমরা এগিয়ে যাও, আমি ঠিক তোমাদের পিছনে পিছনে যাচ্ছি।

দেখতে দেখতে সূর্যদেব পাটে বসলেন। দিনের আলোর শেষ রেখাটুকু দিগন্তে মিলিয়ে গেল। গাঢ় অন্ধকার নেমে এল ধরণীর বুকে। দশহাত দূরের জিনিস দেখা যায় না। সারদাদেবী সঙ্গীদের আর দেখা পাবেন কি ক'রে? অন্ধকারে একাকী তিনি পথ চলতে লাগলেন।

এমন সময় সামনে আসতে দেখলেন অন্ধকারের চেয়েও কালো প্রকাণ্ড এক চেহারা। মাথায় তার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, কাঁধে প্রকাণ্ড এক মোটা লাঠি, হাতে রূপার বালা। তিনি স্থির হয়ে দাঁড়ালেন ও শুনলেন কর্কশ কণ্ঠের এই প্রশ্ন—'এমন সময় কে দাঁড়িয়ে ওখানে?' প্রশ্ন শুনে কি তিনি ভয়ে মূর্ছা গেলেন, না দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করলেন? ভয় তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু তার চিহ্ন তাঁর কথা-বার্তায় প্রকাশ পেল না। দরকার মত উত্তর যেন তাঁর মুখে যোগানো ছিল। তিনি বললেন, "বাবা, আমার সঙ্গীরা আমায় ফেলে গেছে;

আমারও মনে হচ্ছে যেন পথ হারিয়ে ফেলেছি। তুমি আমার সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে দেবে চল। তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন। আমি তাঁরই কাছে যাচ্ছিলাম। তুমি যদি আমাকে তাঁর কাছে রেখে আসতে পার বাবা, তাহ'লে তিনি তোমাকে খুব যত্ন করবেন।" এই বলে তিনি তাড়াতাড়ি পায়ের রূপার মল ছ'গাছা খুলে সেই অপরিচিত বাগদি পুরুষের হাতে দিলেন। তাঁর কথা শেষ হ'তে না হ'তে এক স্ত্রীলোক এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। তিনি তখন যেন অনেকটা স্বস্তি বোধ করলেন এবং সেই মেয়েটির হাত ধরে বললেন, "আমি তোমার মেয়ে সারদা। সঙ্গীরা ফেলে যেতে বিষম বিপদে পড়েছিলাম। ভাগ্যিস বাবা ও তুমি এসে পড়লে! নইলে কি যে করতাম!"

তাঁর মিষ্টি কথা, সরল ব্যবহার ও ছোট ছেলেদের মত পরকে বিশ্বাস ও আপনবোধ দেখে সেই বাগদি স্ত্রী-পুরুষের প্রাণ ভালবাসায় গলে গেল। তাদের মনে হ'ল সারদা যেন তাদের কত জন্মের আপনার মেয়ে। বাগদি-বৌ স্বামীকে বললে, 'আমার মেয়ে এত রাতে আর চলতে পারবে না, থাকবার জায়গা দেখ।' পাশের তেলোভেলো গ্রামে এক দোকানে থাকবার ব্যবস্থা হ'ল। মেয়েটি নিজের আঁচল পেতে তার পথে পাওয়া কন্যাটিকে শুতে দিল—আর পুরুষটি দোকান থেকে মুড়ি-মুড়কি কিনে এনে তাঁকে খেতে দিল। সারদাদেবী ছোট খুকীটির মত শুয়ে শুয়ে খেতে লাগলেন।

পরদিন সকালে তারা সারদাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে গেল তারকেশ্বরে। এক দোকানে তাঁকে বসিয়ে রেখে পুরুষটি গেল বাবা তারকনাথের পূজা দিতে ও সারদাদেবীকে ভাল করে খাওয়ানোর জন্য বাজার করতে। এদিকে তাঁর সঙ্গীরাও তাঁর জন্য খুব ভাবনায় পড়েছিলেন এবং চারদিকে তাঁকে খুঁজছিলেন। দোকানের মধ্যে

তাঁকে পেয়ে সকলে যখন খুব আনন্দিত তখন বাগদি পুরুষটি ফিরলো পূজা সেরে, প্রসাদ ও বাজার নিয়ে। সারদাদেবী সকলের সঙ্গে আশ্রয়দাতাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

যাত্রীর দল শ্রীশ্রীতারকনাথের পূজা দিলেন এবং আহার ও বিশ্রাম সেরে আবার বেরিয়ে পড়লেন বৈদ্যবাটীর দিকে। বাগদি স্বামী-স্ত্রীও কিছু পথ তাঁদের সঙ্গে এল। কেমনভাবে তারা সারদাদেবীর কাছে বিদায় নিল, সে কথা তাঁর নিজের মুখেই শোনা যাক।—"একটি তো রাত। তার মধ্যে আমরা পরস্পরকে এতদূর আপনার করে নিয়েছিলাম যে বিদায় নেবার সময়ে কাঁদতে লাগলাম। অবশেষে সুবিধামত দক্ষিণেশ্বরে এসে আমায় দেখে যেতে বার বার অনুরোধ করাতে আমার বাগদি বাবা আসবেন বলে স্বীকার করলে অতি কষ্টে তাদেরকে ছেড়ে এলাম। আসবার সময় তারা অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল এবং আমার বাগদি-মা পাশেই ক্ষেত থেকে কতকগুলো কড়াইশুঁটি তুলে এনে আমার আঁচলে বেঁধে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, 'মা সারদা, রাতে যখন মুড়ি খাবি, তখন এইগুলো দিয়ে খাস।'

এই বাগদি পুরুষটি পরে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিল তাদের মাঠে পাওয়া মেয়েকে দেখতে। যাবার সময় খাবার সঙ্গে নিয়ে যেত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের খুব খাতির-যত্ন করতেন। সারদাদেবীর ধারণা ছিল—তাঁর বাগদি বাবা ডাকাত ছিল—এককালে অনেক খুনজখম করেছিল।

তখনকার দিনে সমাজে খাওয়া-ছোঁয়ার যে রকম গোঁড়ামি ছিল তাতে সারদাদেবীর কথা ভাবলে আজকালকার ছেলেমেয়েরাও অবাক হবে নিশ্চয়। বাগদিকে ছুঁলে তখনকার দিনে স্নান করে শুদ্ধ হ'তে হ'ত। কিন্তু সারদাদেবী অসংকোচে বাগদিমেয়ের

আঁচলে গুললেন, তাকে ছুঁয়ে থেকে খেলেন, আবার তাদের কিনে এনে দেওয়া জিনিস রান্না করে খেলেন। সেকালে ব্রাহ্মণের পক্ষে এরকম হীন জাতের দেওয়া কোন জিনিস গ্রহণ করা অপরাধের কাজ বলে বিবেচিত হ'ত সমাজের চক্ষে।

কেউ হয়ত বলবে দায়ে পড়লে ওরকম অনেকে অনেক কিছু করে থাকে কিন্তু বিপদে পড়েই যদি এ করতেন, তাহ'লে পরে তো এ কাজের জন্য তিনি মনে দুঃখ পেতেন বা প্রচলিত প্রথা মেনে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণ এসব ঘটনা জেনেও তো তাঁকে কোন মন্দ বলেন নি বা কোন রকম প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেন নি। তাই মনে হয়, তিনি যে মন্দ কিছু করেছেন এ কথা তাঁদের কারও মনে হয় নি।

আসল কথাটা হচ্ছে এই। ছুৎমার্গ—নীচ জাতের লোককে ছোঁয়া-ছুঁয়ির নিষেধ হচ্ছে উঁচু জাতদের নীচ জাতদের প্রতি ঘৃণার পরিচয়। ঘৃণা স্ত্রীলোকেরও থাকে, পুরুষেরও থাকে। স্ত্রীলোক শুধু ঘৃণা করতে পারে না নিজের সন্তানকে। ছেলের উপর মায়ের যে ভালবাসা, সে ভালবাসা সারদাদেবীর অন্তরে সকল মানুষের উপর ছিল বলেই তিনি অতি সহজভাবে বাগদি দম্পতিকে মা ও বাবা বলে গ্রহণ করে তাদের সঙ্গে নিজের লোকের মত ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।

নবম অধ্যায়

স্বামীসেবা—দক্ষিণেশ্বরে

দক্ষিণেশ্বরে সারদাদেবীর অধিকাংশ সময় স্বামীসেবায় কেটে যেত। স্বামীকে সর্বদা তিনি ইষ্টদেবতা বলে জ্ঞান করতেন, কাজেই স্বামীর সেবা তাঁর কাছে সাধনভজনেরই সমান ছিল। তাঁর সাধনভজনের

কথা আগে কিছু বলা হয়েছে, এখন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর দিনগুলো কি ভাবে কাটত সে কথা আরও কিছু শোনা যাক। কাহিনীটি আরম্ভ করি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্যা যোগেন্দ্রমোহিনী দেবীর (যিনি 'যোগেন-মা' নামে পরিচিত) মুখের ভাষায়। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ও ভক্তগণ তাঁকে 'ঠাকুর' এবং সারদাদেবীকে 'মা' বলতেন ও বলে থাকেন। যোগেন-মা বলছেন,—"তিনি (মা) দক্ষিণেশ্বরে ভোর চারটার আগে শৌচাদি সেরে ধ্যানে বসতেন। ঠাকুর সকাল সন্ধ্যায় ধ্যান করতে বলতেন কিনা। এর পর বাসি কাজকর্ম সেরে পূজায় বসতেন। পূজা, জপ, ধ্যান,—এতে প্রায় দেড়ঘণ্টা কেটে যেত। তারপর রান্না করতে বসতেন। রান্না হ'লে যেদিন সুযোগ ঘটত সেদিন নিজ হাতে ঠাকুরকে স্নানের জন্য তেল মাখিয়ে দিতেন। সাড়ে দশটা এগারটার মধ্যে ঠাকুর আহার করতেন। ঠাকুর স্নানে যেতেন। মা এসে তাড়াতাড়ি তাঁর জন্য পান সেজে রেখে নজর রাখতেন ঠাকুর স্নান করে ফিরলেন কিনা। ঠাকুর তাঁর ঘরে এলেই মা এসে জল ও আসন দিয়ে তারপর খাবারের থালা নিয়ে এসে ঠাকুরকে আহারে বসাতেন। সে সময় নানা কথার মধ্য দিয়ে মা চেষ্টা করতেন, যাতে খাবারের সময় (ঠাকুরের) ভাবসমাধি উপস্থিত হ'য়ে আহারে বিঘ্ন না জন্মায়। ঠাকুরের খাওয়া হ'লে মা একটু কিছু মুখে দিয়ে জল খেয়ে নিতেন। তারপর পান সাজতে বসতেন। পান সাজা হয়ে গেলে গুন্ গুন্ করে গান গাইতেন। তা খুব সাবধানে; যেন কেউ শুনতে না পায়। এর পর যখন কলের একটার বাঁশী বেজে উঠত, তাই শুনে তিনি খেতে বসতেন। সুতরাং দেড়টা দু'টার আগে কোন দিনই মা'র খাওয়া হ'ত না। আহারের পর নামমাত্র একটু বিশ্রাম করে চুল শুকোতে বসতেন—তিনটা নাগাদ—সিঁড়িতে। তারপর আলোটালো ঠিকঠাক করে তোলা জলে 'নমো নমো' করে

মুখ-হাত ধুয়ে কাপড় কেচে সন্ধ্যার জন্য প্রস্তুত হতেন। সন্ধ্যা হ'লে আলো দিয়ে ঠাকুর-দেবতার সামনে ধুনো দিয়ে মা ধ্যানে বসতেন। এর পরে রাত্রের রান্না, ঠাকুরকে খাওয়ানো, শাশুড়ীকে জলখাওয়ানো সেরে মা আহার করতেন। তারপর একটু বিশ্রাম করেই শুয়ে পড়তেন। এই সকল কাজের মধ্যে যখনই ঠাকুরের মা 'বৌ' বলতেন, তখনই মা চঞ্চল হ'য়ে ছুটে যেতেন। একদিন বলেছিলাম, 'মা, "বৌ" শুনেই যে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে ছুটে যাও—কোন্‌দিন নীচু দরজায় মাথা ঠুকে রক্তারক্তি করবে।' মা হেসে বললেন,—'তা না হয় একটু হ'লই বা। তিনি যে পরমগুরু। ওঁর মা—আমারও মা। আহা, বুড়ো হয়েছেন, সময়মত না যেতে পারলে ওঁর (শাশুড়ীর) কত অসুবিধা। তাই ত মা ছুটে যাই'।"

প্রথম প্রথম দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাজ খুব বেশি ছিল না। তিন-চারজনের রান্না ও অন্যান্য সাংসারিক কাজ। কিন্তু দিনে দিনে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং ভক্তরা দলে দলে তাঁর কাছে যাতায়াত আরম্ভ করলেন। ভক্তরা কেহ কেহ রাতে দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে থাকতে লাগলেন সাধনভজনের জন্য, এই সঙ্গে সারদাদেবীর কাজও বেড়ে চলল। কোন কোন দিন তিন-চার সের আটার রুটি করতে হ'ত। তার উপর কারও বা খিচুড়ির দরকার, কারও বা ছোলার ডাল পছন্দ। তাঁর কাজের চাপ দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ দু'একজন ভক্তকে তাঁকে সাহায্য করতে লাগিয়েছিলেন।

লাটু নামে এক হিন্দুস্থানী ছেলে অল্পদিন হ'ল দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করছেন। তাঁকে একদিন পঞ্চবটীতে ধ্যান করতে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "ওরে লেটো, যার ধ্যান করছিস সে যে নহবতে রুটি বেলছে।" এই কথা শুনে লাটু ধ্যান ছেড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের পিছনে পিছনে আসতে লাগলেন। তিনি তাঁকে সারদাদেবীর কাছে নিয়ে

গিয়ে বললেন, "এ ছেলেটি বেশ, তোমার ময়দা মেখে দেবে।" এই লাটু পরে স্বামী অদ্ভুতানন্দ নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

তখন দক্ষিণেশ্বরে কি যে আনন্দের স্রোত বয়ে চলেছিল সে কথা ত মুখে বলে বোঝাবার নয়। দিনের পর দিন শত শত লোক আসছে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ পেয়ে ধন্য হবার জন্য। বালক আসছে, বৃদ্ধ আসছে, স্ত্রী আসছে, পুরুষ আসছে, গৃহস্থ আসছে, সন্ন্যাসী আসছে, ভিখারী আসছে, আবার রাজা-রাজড়াও আসছে। দিনরাত তাঁর ঘরে ভিড় লেগেই আছে। সামনে চলছে ভজন-কীর্তন, ভগবানের বিষয়ে আলোচনা। পণ্ডিত তিনি ছিলেন না, শাস্ত্র পড়েন নি, শ্লোকও আওড়াতেন না। কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে যাই বেরুত তাই ছিল বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণের সারকথা। তা শুনে ভক্ত পেতেন আনন্দ, দুঃখীর দুঃখ যেত ঘুচে, শোকে কাতর ব্যক্তি পেত সান্ত্বনা, ঘোর বিষয়ীর প্রাণে দপ্ করে জ্বলে উঠত বৈরাগ্যের আলো। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন এক আশ্চর্য রকমের সাধু। তিনি যে কেবল দিনরাত মুখটি গম্ভীর করে থাকতেন তা নয়। ফষ্টিনষ্টি হাসি-তামাশা করে সময় সময় তিনি তাঁর ছোকরা ভক্তদের সঙ্গে হাসির হাট বসিয়ে দিতেন। তাদের হাসির কলরোলে ছোট কামরাটি যেন ফেটে পড়ত। তখন কে আর বলবে যে এই ব্যক্তিটি একটু আগে ভগবানের ভাবে বিভোর হয়ে জগৎ ভুলে ছিলেন।

সারদাদেবী দিনরাত যে কেবল কাজই করতেন তা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে যে সব ভজন-কীর্তন ভগবানের প্রসঙ্গ চলত তিনি সে সকলের আনন্দ থেকেও বঞ্চিত হতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের থাকবার ঘর থেকে নহবত-ঘর তো আর বেশি দূরে নয়। ঐ ঘরের উত্তরের দরজা খোলা থাকলে ঘরের ভিতরের অনেক কিছু নহবত থেকে দেখা যায়। ঐ দরজা প্রায় খোলা থাকত আর সারদাদেবী

নহবতের বারান্দায় যে দরমার বেড়া দেওয়া হয়েছিল তা ফুটো করে দাঁড়িয়ে থাকতেন শ্রীরামকৃষ্ণের পানে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দেখে দেখে দেখার আশ আর মিটত না; শুনে শুনে কান আর তৃপ্তি মানত না। দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থেকে তার পায়ে বাত ধরে গিয়েছিল। এই সময়কার কথা তিনি নিজের মুখে এই রকম বলেছেন, —"দক্ষিণেশ্বরে কী সব দিনই গেছে মা! ঠাকুর কীর্তন করতেন, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নহবতের ঝাপড়ির ভিতর দিয়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম, হাত জোড় করে পেন্নাম করতুম, কী আনন্দই ছিল। দিনরাত লোক আসছে, আর ভগবানের কথা হচ্ছে। নাচ গান ভাবসমাধি দিনরাতই চলছে। ঠাকুরের কাছে কত ভক্ত আসত, গান কীর্তন হ'ত; তাই শুনতাম আর ভাবতুম, আমি ঐ ভক্তদের মত একজন হতুম তো বেশ ঠাকুরের কাছে থাকতে পেতুম, কত কথা শুনতুম।"

আগেই বলেছি, সারদাদেবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ সাধ্যমত চেষ্টা করতেন। তিনি সারদাদেবীকে বলতেন, "বুনো পাখী খাঁচায় রাতদিন থাকলে বেতে যায়; মাঝে মাঝে পাড়ায় বেড়াতে যাবে।" দুপুর বেলায় লোকে যখন বিশ্রাম করত তখন তিনি সারদাদেবীকে বলতেন, "এখন যাও, বাইরে কেউ নাই।" সারদাদেবী খিড়কির ফটক দিয়ে বেরিয়ে যেতেন এবং পাঁড়েগিন্নির বা পাড়ার আর কারও বাড়িতে কথাবার্তায় সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটিয়ে আরতির সময় নহবতের ঘরে ফিরতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসঙ্গে সারদাদেবী একদিন বলেছিলেন, "ঠাকুর যে অমন ত্যাগী ছিলেন, তবু আমার জন্য ভাবনা ছিল। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'তোমার ক'টাকা হ'লে হাত-খরচ চলে?' আমি বললাম, এই পাঁচ-ছ'টাকা হ'লেই চলে। তারপর জিজ্ঞাসা করছেন, 'বিকেলে ক'খানা রুটি খাও?' আমি তো লজ্জায় বাঁচি না।

—কি ক'রে বলি ! এদিকে বার বার জিজ্ঞাসা করছেন। তাই বলতে হ'ল, এই পাঁচ-ছ'খানা খাই।"

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা সম্পর্কে একটা ঘটনার এখানে উল্লেখ করছি। এতে আমরা দেখতে পাব শ্রীরামকৃষ্ণের উপর অগাধ ভালবাসার সঙ্গে পতিত দুঃখীর প্রতি সারদাদেবীর অপরিসীম করুণা। একদিন তিনি রান্নার পর শ্রীরামকৃষ্ণের খাবার নহবত-ঘর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় তাঁর কাছে উপস্থিত একটি স্ত্রীলোক আগ্রহ প্রকাশ করে ভাতের থালাটি তাঁর হাত থেকে নিয়ে নিল। মেয়েটিকে অসৎ-চরিত্রা জেনেও থালাটি না দিয়ে পারলেন না। ভাতের থালাটি ধরে দিয়ে মেয়েটি চলে গেল, সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণকে খাওয়াতে বসলেন। কিন্তু তিনি মন্দ স্বভাব লোকের ছোঁয়া জিনিস খেতে পারতেন না। নিজের চোখে ছুঁতে না দেখলেও তাঁকে এরকম লোকের ছোঁয়া জিনিস দিলেই তিনি বুঝতে পারতেন। আসনে বসে তিনি হাত গুটিয়ে রইলেন আর বললেন, "একি করলে বল দিকি ? খেতে যে পারছি না। ওর হাতে থালা দিলে কেন ? তুমি কি জান না যে ওর স্বভাব খারাপ ?" তিনি বললেন, "কি করব বল ? ও এমন জেদ করলে যে না দিয়ে পারলুম না। কোন রকমে দু'টি খাও।" শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন "খেতে যে পারছি না। বল, আর কখনও এরকম করে যার তার হাতে খাবার দেবে না।" উত্তরে সেই অসীম করুণাময়ী দেবী বললেন, "তা এরকম সত্য করতে পারব না। 'মা' বলে কেউ কিছু চাইলে আমি যে 'না' বলতে পারি না।" শ্রীরামকৃষ্ণ আর কোন কথা না বলে অল্প দু'টি খেলেন।

দশম অধ্যায়

স্বামী-স্ত্রী

শ্রীরামকৃষ্ণের এক প্রধান শিক্ষা হচ্ছে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে না পারলে ভগবান লাভ হবে না। এ কথার অর্থ যাঁরা ঠিক ঠিক বোঝেন না তাঁরা মনে করেন, শ্রীবামকৃষ্ণ বুঝি নারীজাতীকে খুব ঘৃণা করতেন। বিশেষ করে আজকালকার একদল শিক্ষিত ছেলেমেয়ে, যারা আমাদের দেশেব শিক্ষা-সভ্যতার কোন চর্চা করে না, বিদেশী চালচলন ও সমাজ বিষয়ে নতুন নতুন মত যাদের কাছে খুব মনোরম বোধ হয়, তারা তো কথাটা শুনলে আঁতকে ওঠে। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ বলতে তিনি কি বোঝাতেন, সেকথা বিস্তৃতভাবে আলোচনার স্থান এ নয়। তবে তাঁর সারা জীবনের আচরণ দেখলে সকলেই বুঝতে পারবে, নারীজাতির উপর তাঁর কী অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। সে ধরনের শ্রদ্ধা খুব কম লোকই মেয়েদের উপর দেখাতে পারে। সারদাদেবীর উপর যে গভীর প্রীতি, সম্মান ও শ্রদ্ধা তিনি বরাবর দেখিয়ে এসেছেন শুধু সেইটুকু আলোচনা করলেই বোঝা যাবে নারীদিগকে তিনি কি চোখে দেখতেন।

হিন্দুনারী চিরদিন স্বামীকে দেবতার ন্যায় সম্মান করে আসছেন। তবে একদল পুরুষ যে মনে করেন, তাঁদের স্বভাবচরিত্র যে রকমই হোক না কেন, স্ত্রীরা সব সময় দাসীর মতো তাঁদের হুকুম তামিল করবে, এটা ঠিক নয়। এই রকম একটা অন্যায় ধারণা পুরুষদের মনে আসার জন্য, পুরুষরা স্ত্রীলোকদের উপর তাঁদের কর্তব্য ভুলে স্ত্রীলোকদিগকে হীন ভাবতে শেখার ফলে দেশের অধঃপতন হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর মধ্যে দেখি এক অদ্ভুত সম্পর্ক। সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণকে চিরদিন নিজের. ইষ্টজ্ঞানে পূজা করতেন।

আবার অন্য পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণও সারদাদেবীকে দেখতেন নিজের ইষ্টদেবীরূপে। তিনি কোনদিন সারদাদেবীকে 'তুই' বলেন নি। একদিন ভুলক্রমে তুই বলার জন্য যে কি রকম দুঃখিত হয়েছিলেন, সেই কথাটা বলছি।

সারদাদেবী একদিন বিকালে শ্রীরামকৃষ্ণের খাবার তাঁর ঘরে রেখে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন তাঁর ছোট তক্তাপোশটির উপর চোখ বুজে শুয়ে ছিলেন। তাঁর ভাইঝি লক্ষ্মীদেবী তখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, লক্ষ্মী বুঝি খাবার দিতে এসেছে। তিনি চোখ বুজে থেকেই বললেন, "ওরে, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস্।" বারান্দা থেকে তাঁর কথার উত্তর এল, "হাঁ, দোর ভেজিয়ে রেখেছি।" গলার স্বরে তিনি বুঝলেন—সারদাদেবী এসেছিলেন, লক্ষ্মী নয়। তখন তিনি বিছানা ছেড়ে বারান্দায় সারদাদেবীর সামনে এসে দাঁড়ালেন অতি সঙ্কুচিত ভাবে, যেন কত অপরাধ করেছেন। বললেন, "আহা তুমি! আমি ভেবেছিলাম লক্ষ্মী। তা দেখ, কিছু মনে করো না যেন।" সারদাদেবী বললেন, "তা বললেই বা।" কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ কি তাতে সান্ত্বনা পেলেন? পরের দিন সকালবেলা নহবতের কাছে গিয়ে সারদাদেবীকে ডেকে বললেন, "দ্যাখ গা, সারারাত আমার ভেবে ভেবে ঘুম হয় নি। কেন এমন রুক্ষ কথা বলে ফেললাম।" এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, তিনি সারদাদেবীকে যেমন ভালবাসেন তেমন সমীহ করে চলতেন।

একসময় সারদাদেবী নহবতে প্রায় একা একা থাকতেন। তাঁর কাছে এক বুড়ী আসত। যৌবনকালে সে বুড়ীর স্বভাবচরিত্র মন্দ ছিল। সে গেলে সারদাদেবী তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন। তাকে একদিন দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "ওটাকে এখানে কেন?" সারদাদেবী উত্তর দিলেন, "ও এখন ভাল কথাই তো বলে। কত

হরি-কথা—তাতে দোষ কি?” শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন,—“ছি ছি! ও যে বদ, ওর সঙ্গে কি কথা! শত হোক, রাম রাম!” এ কথাবার্তার পরও সে বুড়ী প্রায় সরদাদেবীর কাছে ‘মা’ বলে এসে দাঁড়াত। তিনি তাকে বসতে বলতেন, যত্ন করে যখন যা থাকত, খেতে দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণও দেখতেন, কিন্তু আর কোন কথা কোন দিন বলেন নি বা বিরক্তির ভাব পর্যন্ত দেখান নি। অথচ কাউকে কোন অন্যায় করতে দেখলে কোন দিন তিনি ছেড়ে কথা কইতেন না।

এই ঘটনার উল্লেখ করে সারদাদেবী একসময় বলেছিলেন, “পাছে কুবুদ্ধি শেখায়, এই ভয়ে উনি ওসব লোকের সঙ্গে কথাটি পর্যন্ত বলতে নিষেধ করতেন। এত করে তিনি আমায় রক্ষা করেছেন।”

এই দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বুঝতে পারি, সারদাদেবীর মন যে শক্ত একথা তিনি ভালভাবেই বুঝতেন; ঐ কথাগুলো বলেছিলেন শুধু একটা আদর্শ শেখাবার জন্য। সে আদর্শ টা হচ্ছে সংসারে সুখে-শান্তিতে বাস করতে হ'লে পরিবারের মধ্যে যাতে কোন অসৎ বিষয়ের আলোচনা না হয় বা অসৎ চরিত্রের লোক প্রশ্রয় না পায়, সে বিষয়ে সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে। আর, এই কাজে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই সমান দায়িত্ব।

সারদাদেবীর নিজের দায়িত্ববোধ ও আত্মমর্যাদাজ্ঞান ছিল প্রচুর। তাঁর গণ্ডীর মধ্যে, যে কাজে তাঁর বিশেষ দায়িত্ব, তাতে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ হাত দিলেও তিনি সইতে পারতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এই ভাবকে খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন। ভক্তেরা যেসব ফল সন্দেশ ইত্যাদি আনতেন সেগুলা সারদাদেবী খুব যত্ন করে রাখতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্ত শিষ্যগণকে দিতেন। নিজে নিতেন নাম-মাত্র। সঞ্চয় বড় করতেন না। বেশি কিছু এলে পাড়ার ছেলেদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। কি জানি কেন, একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের মনে

হ'ল সারদাদেবী বড় বেশি খরচ করছেন। তিনি বললেন, "এত খরচ করলে চলবে কি করে?" তাঁর কথায় সারদাদেবী বুঝলেন, তাঁর কাজ শ্রীরামকৃষ্ণ পছন্দ করছেন না। সুতরাং যেমনি একথা শোনা অমনি কোন উত্তর না দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর থেকে নহবতের দিকে চললেন। তাঁর যেন মনের ভাব—দেওয়া-থোওয়া তো মায়েদের কাজ, পুরুষে তা নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন? তাঁকে চলে যেতে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যস্ত হয়ে বললেন, "ওরে রামলাল, যা তোর খুড়ীকে গিয়ে শান্ত কর্। ও রাগ করলে (নিজেকে হাত দিয়ে দেখিয়ে) এর সব নষ্ট হয়ে যাবে।"

যে সব বালক-ভক্ত সাধনভজনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে থাকতেন, রাতের খাওয়ার জন্য তাঁদের কাকে ক'খানা রুটি দিতে হবে তা তিনি সারদাদেবীকে বলে দিয়েছিলেন। বাবুরামের (যিনি পরে স্বামী প্রেমানন্দ নামে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁর) বরাদ্দ ছিল চার খানা। একদিন আহারের পর বাবুরাম শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁরে বাবুরাম, ক'খানা রুটি খেলি?"

'ছ'খানা।"

"এত বেশি খেলি কেন?"

"মা দিলেন যে।"

এই বেশি খাওয়াটা তিনি পছন্দ করলেন না। কথাটা শুনেই চটি জোড়াটা পায়ে দিয়ে ফট্‌ফট্ করে নহবতের ঘরে হাজির। বললেন, "হ্যাঁগা, তুমি ছেলেগুলোকে কি মানুষ হ'তে দেবে না? এ বয়সে যদি এত খাবে, তবে তেজ রাখবে কোথায়?" তাঁর কথায় মনে হ'ল সারদাদেবী যেন একটা অন্যায় কাজ করেছেন, আর তিনি সাবধান করে দিতে এসেছেন। কথাগুলো সারদাদেবীর প্রাণে বেশ লাগল। তিনি বললেন, "একদিন ছু'খানা রুটি বেশি দিয়েছি বলে

যখন তোমার এত ভাবনা হয়েছে—তা ওদের জন্য তোমাকে আর ভাবতে হবে না। আমিই ওদের দেখব। তুমি আর ওদের খাওয়া নিয়ে কিছু বলো না যেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ আর কিছু না বলে একটু হেসে ঘরে ফিরে এলেন।

এই যে তিনি বললেন, ছেলেদের তিনি দেখবেন, এ কথা বলার যোগ্যতা তাঁর ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণও তা জানতেন। জগতে যে কাজের জন্য তিনি এসেছিলেন, তাঁর অবর্তমানে সে কাজের দায় স্বামী বিবেকানন্দের মতো সারদাদেবীকেও দিয়েছিলেন। তাঁর শরীর থাকতে থাকতেই প্রধান শিষ্যদের কাউকে কাউকে সারদাদেবীর কাছে দীক্ষা নেবার আদেশ দিয়েছিলেন।

সারদাদেবী সকল রকমে চেষ্টা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের উপযুক্ত সহধর্মিণী হবার জন্য। স্বামীর জীবনের আদর্শকে সর্বপ্রকারে তিনি নিজের করে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ত্যাগ। এই ত্যাগের ভাবকে সারদাদেবী অতি সহজে আপনার করে নিতে পেরেছিলেন। একটা ঘটনার উল্লেখ করলে কথাটা বেশ বোঝা যাবে।

লছ্‌মীনারায়ণ নামে এক ধনী মাড়োয়ারী ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করতেন। একদিন তাঁর বিছানার চাদর ময়লা দেখে ভক্তটি দশহাজার টাকা তাঁর নামে ব্যাঙ্কে জমা রাখতে চাইলেন, যাতে ঐ টাকার সুদে তাঁর সেবা চলতে পারে। যিনি একটা পয়সা ছুঁতে পারতেন না, মনেপ্রাণে ষোল আনা যিনি ভগবানের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, কথাটা শুনে তাঁর মাথায় যেন বাজ পড়ল। তিনি টাকা নেবেন, আর এত টাকা! প্রথমে ভক্তকে খুব তিরস্কার করলেন; তারপর তাঁর মাথায় এক বুদ্ধি খেলল। তিনি চাইলেন সারদাদেবীর মনের অবস্থা পরীক্ষা করতে। তাঁকে ডাকিয়ে বললেন, "এ ভক্ত

এত টাকা দিতে চাচ্ছে। তা আমি সন্ন্যাসী—আমি তো আর নিতে পারি না। তুমি ইচ্ছা করলে নিতে পার।" এত টাকা এক সঙ্গে পেলে আমাদের যে কেউ আহ্লাদে আটখানা হয়ে যেতুম। নয় কি? কিন্তু সারদাদেবী কি উত্তর দিলেন! তিনি বললেন, "না, তা হ'তে পারে না। তোমার নেওয়া যা আমার নেওয়াও তা। আমার কাছে টাকা থাকলে তোমারই কাজে লাগবে—আর আমার মনে হবে আমাদের টাকা আছে। উত্তর শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ যে খুব খুশি হলেন, সে কথা আর না বললেও চলে।

মহাপুরুষেরা আসেন সময়ের উপযোগী আদর্শ লোককে দেখাতে। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মেছিলেন এযুগের পথহারা মানুষকে পথ দেখাতে, সকলকে সত্যের সন্ধান দিতে। সেযুগে রাজার ছেলে সিদ্ধার্থ বৈরাগ্যের প্রেরণায় বাপ-মা-স্ত্রী-পুত্র সকলকে অকূলে ভাসিয়ে বনবাসী হয়েছিলেন সত্যের সন্ধানে। জ্ঞানের আলোক পেয়ে আবার যখন তিনি ফিরে এলেন লোকালয়ের মাঝে, জগতের যত দুঃখী তাপী যখন তাঁর করুণা পেয়ে ধন্য হয়ে যেতে লাগল, তখন গোপাও তাঁর দয়া পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে দূরে থাকতে হয়েছিল ভিক্ষুণীর আশ্রমে—স্বামীর সঙ্গে বাস বা স্বামীকে সেবা করার সৌভাগ্য তাঁর হয় নি। পতিত তাপিতের প্রতি করুণা বাঙলা মায়ের স্নেহের দুলাল নিমাইকে যেদিন ঘর ছাড়িয়ে পথে টেনে বার করেছিল, সে দিন তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে চিরতরে পরিত্যাগ করেছিলেন। পথে পথে হরিনাম বিলিয়ে হাজার হাজার পাপী-তাপীকে তিনি উদ্ধার করেছেন, কত দীনহীন অধমকে তিনি কোল দিয়ে ধন্য করেছেন। কিন্তু দুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়াকে শুধু অন্তরে অন্তরে স্বামীর পূজা করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে—প্রত্যক্ষভাবে স্বামীসেবার সৌভাগ্য তাঁর আর ঘটে নি।

কিন্তু এযুগের মানুষের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ দেখালেন এক নূতন

আদর্শ। জগতের সব কিছু ভোগসুখ মিথ্যা বুঝে এবং ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য জেনেও তিনি বিয়ে করেছিলেন। তারপর অবশ্য কিছুকাল সাধনভজনে একেবারে ডুবে গিয়েছিলেন। তখন জগতের জ্ঞানই তাঁর ছিল না, পরম আদরের যে নিজের দেহ তাও তাঁর ভুল হয়ে গিয়েছিল, স্ত্রীর কথাই বা মনে রাখবেন কি করে! কিন্তু যুবতী স্ত্রী যখন নিজে থেকে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন তখন তিনি তাঁকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেন না, বরং পরম যত্নে নিজের কাছে স্থান দিলেন। অথচ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বলতে লোকে যা বুঝে থাকে, সে সম্পর্ক তাদের কোন দিন ঘটল না। যে যুগে মানুষ ঈশ্বর, পরকাল, ধর্মকর্ম সব বাজে বলে মনে করতে আরম্ভ করেছে, যখন বেশির ভাগ শিক্ষিত সভ্য মানুষ ভোগবিলাস, দেহের পাঁচরকম সুখ ইত্যাদি মানবজীবনের লক্ষ্য বলে ধরে নিয়েছে, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ দেখাতে এলেন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের এক নূতন আদর্শ। গৃহস্থের জীবন কেমন হওয়া উচিত, তা তিনি দেখালেন তাঁর সারদাদেবীর সহিত অপরূপ সম্পর্কের ভিতর দিয়ে। ভক্তদের প্রতি তাঁর উক্তি, "আমি যদি ষোল আনা করি, তবে তোরা এক আনা করবি।"

একাদশ অধ্যায়

শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে

চিরদিন আর সমান যায় না। ভক্তদের নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ যে আনন্দের হাট বসিয়েছিলেন তা ভাঙবার সময় হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে সারদাদেবীর দুঃখের এবং পরীক্ষার দিন এল। অতিরিক্ত পরিশ্রমে, অনবরত কথা বলার ফলে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের

গলায় বেদনা ও ঘা হ'ল। চিকিৎকেরা পরীক্ষা করে বললেন, 'রোহিণী' রোগ হয়েছে—ইংরাজীতে যাকে বলে ক্যান্‌সার। চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'ল, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে উপযুক্ত ডাক্তার কবিরাজ পাওয়ার বড় অসুবিধা। তাই ভক্তেরা কলকাতার শ্যামপুকুর স্ট্রীটে এক বাড়ি ভাড়া করে সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে সেখানে আনলেন। সারদাদেবী কিছুদিন একা একা দক্ষিণেশ্বরে রইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্যামপুকুরে এনে ভক্তেরা কিন্তু দুই মহা অসুবিধার মধ্যে পড়লেন। শুধু ভাল ডাক্তার ও ভাল ওষুধের ব্যবস্থা করলেই তো আর রোগ আরাম হয় না—উপযুক্ত পথ্যের এবং দরকারমত সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থাও তো করা চাই। দিনের বেলা অনেকে আসেন যান, কিন্তু গৃহস্থ ভক্তদের রাতের বেলা থাকার বড় একটা সুবিধা হয় না। ছোকরা ভক্তেরা দল বেঁধে স্কুল-কলেজ কামাই করে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতে প্রস্তুত হলেন; এ কাজের জন্য বাড়িতে গালমন্দ খাওয়াটা তাঁরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না। কিন্তু পথ্য প্রস্তুতের ভার কাকে দেওয়া যায়? এতদিন দেখা গেছে, একমাত্র সারদাদেবীই শ্রীরামকৃষ্ণের পছন্দমত এবং তাঁর পেটে সয় এমন পথ্য তৈরী করতে পারেন। কিন্তু তিনি যে দারুণ লজ্জাশীলা। এই একমহলা বাড়িতে যেখানে মেয়েদের স্বতন্ত্র থাকার মত কোন ঘর নাই, সেখানে এসে কি তিনি এত পুরুষের মধ্যে থাকতে পারবেন? অল্প যে কয়জন ভক্তের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তাদের ছাড়া আর কারও সঙ্গে তিনি কথা কইতেন না—অধিকাংশ পুরুষভক্ত কোন দিন তাঁকে চোখেও দেখেন নি। তা যাহোক, ভক্তেরা কথাটা একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ওঠালেন। তাতে তিনি বললেন, "সে কি এখানে এসে থাকতে পারবে? তা তাকে বলে দেখ, সকল কথা জেনেশুনে সে আসতে চায়, আসুক।"

সারদাদেবীর নিজের উপর কর্তব্যনির্ণয়ের ভার পড়ল। লজ্জা-শীলতা যেন তাঁর পরনের কাপড়ের মতো ছিল, তাই দিয়ে তিনি সর্বদা নিজেকে ঢেকে রাখতেন। কিন্তু দরকার হ'লে তিনি লজ্জা-সঙ্কোচকে দূরে ত্যাগ করে সাহসের সঙ্গে যখন যেমনটি দরকার করতে পারতেন। স্বামীর সেবার প্রয়োজনের কাছে নিজের কোন অসুবিধা কি আর পথ আগলে দাঁড়াতে পারে? ভক্তদের আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপস্থিত হলেন শ্যামপুকুরের বাড়িতে।

শ্যামপুকুরের সেই ছোট বাড়িতে নিজের সব রকম অসুবিধা হাসিমুখে সহ্য করে কিভাবে যে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় তিনি দিনগুলি কাটিয়েছেন, ভাবলে অবাক হ'তে হয়। বাড়িতে একটিমাত্র পায়খানা, স্নানের জায়গাও একটি। কাজেই তিনি রাত তিনটার পূর্বে উঠে শৌচ-স্নানাদি সেরে নিয়ে ছাদে ওঠার সিঁড়ির পাশের চালাতে চলে যেতেন। সারাটা দিন সেখানে কাটাতেন। সেটাই ছিল রাঁধবার জায়গা। পথ্য তৈরি হ'লে লাটু বা বুড়ো গোপালের মারফৎ খবর দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর থেকে লোক সরিয়ে দিতেন এবং তাঁকে খাইয়ে আসতেন। কোন কোন দিন ভক্তেরা নিজেরা পথ্য এনে খাওয়াতেন। দুপুরে সেই চালাতে তিনি খেতেন ও বিশ্রাম করতেন। রাত এগারটার সময় যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়তেন তখন তিনি দোতলায় নামতেন এবং যে ঘরটি তাঁর নির্দিষ্ট ছিল সেই ঘরে ঘুমুতেন। আবার রাত দু'টার পরে প্রায় উঠে পড়তেন। এই রকমে ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে তিনি ছিলেন খুশি—প্রাণে কেবল আশা, শ্রীরামকৃষ্ণ কবে সুস্থ হবেন। মনে অন্য চিন্তার আর স্থান নাই। এমন নীরবে নিঃশব্দে সেখানে কাটাতেন যে যাঁরা প্রত্যহ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করতেন তাঁরাও অনেকে জানতেন না যে, তিনি শ্রীরাম-কৃষ্ণের প্রধান সেবার ভার নিয়ে সেখানে আছেন।

শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় মাস তিনেক ছিলেন। সেখানে চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার কোন ত্রুটি না হ'লেও রোগের কোন উপশম হ'ল না। সেখানকার বাড়িটায় নানারকমের অসুবিধা ছিল। ডাক্তাররাও বললেন, ধুলোয়-ধোঁয়ায় ভরা কলকাতার আবহাওয়া রোগ সারাবার পক্ষে মস্ত এক বাধা; কাছাকাছি কোন ফাঁকা জায়গায় গেলে ভাল হয়। তখন ভক্তেরা শহরতলী কাশীপুরে মাসিক ৮০৲ টাকায় এক বাগানবাড়ি ভাড়া নিলেন। চমৎকার বড় বাগানটি নানারকমের ফলফুলের গাছে ভরা—বড় পুকুরে স্বচ্ছ জল। শহরের কোন ঝামেলা নাই—নির্জন, নিস্তব্ধ। এখানে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ খুব খুশি হলেন—সারদাদেবীও নির্বিঘ্নে সেবার ও থাকার সুবিধা দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

কাশীপুরে তাঁকে খুব পরিশ্রম করতে হ'ত। তিন রকমের রান্না—শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য পথ্য তৈরি, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তদের জন্য রান্না এবং আর সকলের জন্য রান্না। কিন্তু তাঁর কিছুতে ক্লান্তিবোধ নাই। তাঁর তখনকার মনের অবস্থা সম্বন্ধে বলেছেন, "ওঁর সামনে যতক্ষণ থাকতাম ততক্ষণ আনন্দে ভরপুর থাকতাম। ঘরে এলেই মনে হ'ত, এর পর কি হবে?"

এখানে শ্রীরামকৃষ্ণকে একদিন তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে দেখে সারদাদেবী বললেন,—কি বলবে বলই না।" তাঁর কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ যেন কোন্ রাজ্য থেকে ফিরে এলেন এবং একটু উত্তেজিতভাবেই বললেন, "হ্যাঁগা, তুমি কিছু করবে না, এ-ই সব করবে?" তিনি উত্তর দিলেন "আমি মেয়েমানুষ, আমি কি করব বল?" শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবেশে বললেন, "না গো, তুমি করবে, করবে।" শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখ হয়েছিল যেন তাঁর উদ্দেশ্য জগতে প্রচারের সুব্যবস্থা করার জন্য। এই কাশীপুরের বাগানে তিনি নরেন্দ্রনাথকে আদেশ করেছিলেন সারাজগতে তাঁর বাণী প্রচারের

জন্য ; আর তিনি সারদাদেবীর উপরও ভার দিলেন, যে সব ভক্ত তাঁর কাছে এসে পড়বে তাদের ভগবান লাভের পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য।

গলার ঘা বেড়েই চলছে, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। ডাক্তাররাও কথা বলতে বারণ করেছেন। তবু শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের রোগ সম্বন্ধে যেন কোন হুঁশ নাই, আর কথা বলারও বিরাম নাই। ভক্তদের সর্বদা সাধনভজনে উৎসাহ দিচ্ছেন—কখনও বা হাসি-তামাশা রঙ্গরসের মধ্যে মাতিয়ে তুলছেন। সারদাদেবীও সে বিমল আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন না।

একদিন তিনি বড় এক বাটি দুধ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরের ঘরে উঠছিলেন। হঠাৎ মাথা ঘুরে যাওয়ায় সিঁড়িতে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে ঝন্‌ঝন্ শব্দ। ভক্তেরা ছুটে এসে দেখলেন, তাঁর পায়ে বিষম চোট লেগেছে। সন্তর্পণে তাঁকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হ'ল। তিনদিন শয্যাশায়ী থাকার পর বেদনাসত্ত্বেও আবার নিজের কাজে লাগলেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "একদিন কাশীপুরে আড়াই সের দুধসুদ্ধ একটি বাটি নিয়ে সিঁড়ি উঠতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। দুধ তো গেলই, আমার গোড়ালির হাড় পর্যন্ত সরে গেল। নরেন, বাবুরাম এসে ধরলে। পরে পা খুব ফুলে উঠল। তিনি তাই শুনে বাবুরামকে বললেন, 'তাই তো বাবুরাম, এখন কি হবে, খাবার উপায় কি হবে? কে খাওয়াবে?' তখন মণ্ড খেতেন। আমি মণ্ড তৈরী ক'রে তাঁকে খাইয়ে আসতাম। আমি তখন নথ পরতাম। তাই বাবুরামকে নাক দেখিয়ে হাতটি ঘুরিয়ে ঠারেঠোরে বললেন, 'ও বাবুরাম, ঐ যে ওকে তুই ঝুড়ি ক'রে মাথায় তুলে এখানে নিয়ে আসতে পারিস?' ওঁর কথা শুনে নরেন বাবুরাম তো হেসে খুন। এমনি রঙ্গ তিনি এদের নিয়ে করতেন।"

১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ রাত প্রায় একটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ

তাঁর জীর্ণ স্থূল শরীর ত্যাগ করলেন। তাঁর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। সারদাদেবী 'ওগো মা কালী আমার, কোথায় গেলে গো' বলে কাঁদতে লাগলেন। শ্রীরাকৃষ্ণকে তিনি এইভাবেই দেখে এসেছেন কিনা।

কাশীপুরের শ্মশানঘাটে তাঁর দেহ সংকারের পর সারদাদেবী হাতের বালা খুলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু খোলা হ'ল না। কেন, তা নিজেই বলছেন, "আমি বালা খুলতে যাচ্ছি তিনি খপ্‌ করে এসে হাতটা ধরলেন। বললেন, 'আমি কি মরেছি যে তুমি এয়ো-স্ত্রীর জিনিস হাত থেকে খুলে ফেলছ'?" তিনি সুস্থ শরীরে যেমন ছিলেন সারদাদেবী তাঁকে সেইরূপেই দেখেছিলেন। এই দর্শনের পর তিনি অনেকটা শান্ত হলেন, হাতে বালা রেখে দিলেন, পরনের লালপেড়ে কাপড়ের পাড় অনেকটা ছিঁড়ে সরু করে ফেললেন। সারদাদেবী পরে আরও দু'বার হাতের বালা খুলবার চেষ্টা করেছিলেন এবং দু'বারই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে নিষেধ করেছিলেন। সারদাদেবী তাই বরাবর লাল নরুনপেড়ে ধুতি ব্যবহার করতেন, হাতের বালাও আর কোনদিন খোলেন নি।

মানুষ তো সত্য সত্য মরে না, এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহে যায় মাত্র। আর শ্রীরামকৃষ্ণের মত দেহমানবের কাছে দেহত্যাগ বা শরীর গ্রহণ তো একেবারে ইচ্ছাধীন ব্যাপার। যাঁরা অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস করতে চান না, তাঁরা সারদাদেবীর উক্ত দর্শন সম্বন্ধে এইরূপ বলে থাকেন—'আত্মার অমরত্বে 'এইরূপ বিশ্বাস সকলের থাকলে সংসারের অনেক দুঃখতাপ ও দুর্গতি দূর হয়।' তাঁর জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে বিখ্যাত মনীষী ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই কথা লিখেছেন। তাঁর দিক দিয়ে বিচারে কথাটি ঠিক হ'লেও সারদাদেবীর দেখার মধ্যে কোন ভুল ছিল—এমন মনে করার কারণ নাই।

দ্বাদশ অধ্যায়

তীর্থদর্শনে

অনুরাগী ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন ক'রে কতকাল কাটিয়েছেন। এতদিন জগতের সব দুঃখ তাঁরা ভুলেছিলেন তাঁকে আশ্রয় ক'রে। তিনিই ছিলেন তাঁদের সহায়, সম্বল, আশা, ভরসা। তাঁর মুখের কথা শুনে, তাঁর সেবা করে, তাঁর উপদেশ অনুসারে সাধনভজনে লিপ্ত থেকে কী আনন্দেই না তাঁরা দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁর অদর্শনে ভক্তেরা বড় ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। ঘরবাড়ি, কলকাতা শহর ও তার আশপাশ আর ভাল লাগে না। প্রাণের এ জ্বালা জুড়াবার জন্য একদল স্থির করলেন, তীর্থদর্শনে যাওয়া যাক। চল যাই সেই প্রেমের বৃন্দাবন, যার প্রতি ধূলিকণা নন্দ-নন্দনের পায়ের স্পর্শে পবিত্র হয়ে আছে, যার পাহাড় মাঠ বন নদী হ্রদ সব কিছুর সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের কত না স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে, ভক্তেরা যার কুঞ্জে কুঞ্জে, যমুনার তীরে আজও বাঁশীর ধ্বনি শোনেন, নানা লীলা দেখতে পান। চল সেই শান্তিময় স্থানে ; সেখানে সাধনভজনে দিন কটোনো যাবে।

১৫ই ভাদ্র তাঁরা সারদাদেবীকে নিয়ে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথে দেওঘরে নেমে বৈদ্যনাথের দর্শনাদি সেরে গেলেন কাশীধামে। সেখানে ত্রিরাত্রি বাস করে গেলেন অযোধ্যায়। অযোধ্যায় একদিন কাটিয়ে সকলে রওনা হলেন শ্রীবৃন্দাবনের অভিমুখে। বৃন্দাবনে তাঁরা কালাবাবুর কুঞ্জে আশ্রয় নিলেন। ভক্ত বলরামবাবুদের টাকায় এখানকার বিগ্রহের সেবাপূজার খরচ চলত। বৃন্দাবনে এসে সারদাদেবীর মনে অতীতকালের কত স্মৃতি ভেসে উঠতে লাগল, শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনে তাঁর শোকের সাগর উথলে উঠল। কিছুকাল দিনরাত তিনি কেঁদে কাটালেন। কিন্তু ভগবা'ন তো

ভক্তকে আর চিরদিন কাঁদান না। অল্প কয়দিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন রাতে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, "তোমরা অত কাঁদছ কেন? আমি আর গেছি কোথা? এঘর ওঘর বৈ ত নয়?" এই দর্শনের পর তাঁর চালচলন কথাবার্তা একেবারে বদলে গেল। তিনি যেন হয়ে গেলেন একটি ছোট বালিকা। ছোট বালিকাটির মত আনন্দে এ-মন্দির ও-মন্দির দর্শন করে বেড়ান, কখনো বা যমুনার তীরে কত দূরে চলে যান, সঙ্গীরা আবার খুঁজে আনেন।

বৃন্দাবনে বেশির ভাগ সময় তিনি সাধনভজন, ধ্যানজপে কাটাতেন। এক-একসময় ধ্যানে এমন তন্ময় হয়ে যেতেন যে মাছিতে তাঁর মুখে কামড়ে ঘা করে দিলেও তিনি জানতে পারতেন না। বৃন্দাবন অসংখ্য মন্দিরে ভরা। তিনি অধিকাংশ মন্দির দর্শন করেছিলেন। রাধারমণের মন্দির তাঁর খুব প্রিয় ছিল। এই মন্দিরে তিনি তিন দিন কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করেছিলেন, "ঠাকুর, আমার দোষদৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও। আমি যেন কখনও কারো দোষ না দেখি।" তাঁর এ প্রার্থনা সফল হয়েছিল।

অপরের দোষ খুঁজে বার করতে ও তাই নিয়ে আলোচনা করতে মানুষের যেন বড় ভাল লাগে, বিশেষ করে আমাদের দেশের মেয়েদের। এই পরের দোষ দেখাটাকে তিনি বলতেন 'দোষদৃষ্টি'; তিনি কিছুতেই পরের দোষ দেখতে পেতেন না; পরের মন্দ স্বভাবের কথা তাঁর কাছে কেউ আলোচনা করলেও তিনি বিরক্ত হতেন। তিনি বলতেন, "দোষ তো মানুষ করবেই। ও দেখতে নেই। ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়। দোষ দেখতে দেখতে শেষে দোষই দেখে।.... দোষ কারও দেখো না। দোষ দেখতে দেখতে শেষে দূষিত চোখ হয়ে যাবে।" তাঁর সঙ্গীদের কারও মাঝে এই দোষদৃষ্টি দেখলে তিনি তাঁর নিজের ঐ প্রার্থনার কথা উল্লেখ করতেন এবং বলতেন—

"আমারও আগে লোকের কত দোষ চোখে ঠেকত। তারপর ঠাকুরের কাছে কেঁদে কেঁদে, ঠাকুর আর দোষ দেখতে পারিনে বলে কত প্রার্থনা করে তবে দোষ দেখাটা গেছে। মানুষের হাজার উপকার করে একটু দোষ কর, মুখটি তখনই বেঁকে যাবে। লোক কেবল দোষটি দেখে, গুণটি দেখা চাই।"

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ করছি, যদিও সেটা ঘটেছিল অনেক পরে। সারদাদেবী তখন কলকাতায় 'উদ্বোধনে'র বাড়িতে থাকতেন। তাঁর নিত্যসঙ্গিনী গোলাপ-মা একদিন ঝিকে গালমন্দ করতে করতে উপরের ঘরে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "কি হয়েছে গোলাপ ?" গোলাপ-মা খুব অভিমানের সুরে উত্তর দিলেন, "তুমি ত মা কারুর দোষ দেখাবে না, তোমায় বলে কি হবে ?" উত্তরে তিনি খুব মধুর ভাবে বললেন, "দোষ দেখবার জন্য কি লোকের অভাব হয়েছে গোলাপ, যে আমি না দেখলেই সৃষ্টি অচল হয়ে যাবে ?" গোলাপ মা বললেন, "এ তোমার বাড়ি মা ; তুমি বললে ওরা যেমন শুনবে, আমি বললে কি কেউ শুনতে চাইবে ?" তিনি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, "এ আমার ছেলেদের বাড়ি। ঠাকুর করে দিয়েছেন ওদের মাথা গুঁজবার জন্য। তা তুমি শরৎকে (স্বামী সারদানন্দকে) গিয়ে বল না।" গোলাপ-মা আর কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলেন।

যে সব ভক্ত বৃন্দাবনে যান তাঁরা প্রায় সকলে ৮৪ ক্রোশ পায়ে হেঁটে বৃন্দাবনের চারিদিকটা একবার ঘুরে আসেন। একে বলে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা। আরও কম রাস্তায় পরিক্রমার বিধান আছে। এই পরিক্রমার ফলে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারাণীর সকল লীলার স্থান দেখা যায়। সারদাদেবী চারজন সঙ্গী ও সঙ্গিনী নিয়ে পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা করেন।

বৃন্দাবনে প্রায় এক বৎসর কাটিয়ে তাঁরা হরিদ্বার গেলেন। পরে জয়পুর, পুষ্করতীর্থ ও প্রয়াগতীর্থ দর্শন করে কলকাতায় ফিরলেন। কলকাতায় বলরামবাবুদের বাড়িতে কয়েকদিন কাটিয়ে সারদাদেবী লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন কামারপুকুরে।

১৩০১ সালের শেষভাগে তিনি আর একবার কাশী ও বৃন্দাবন দর্শনে যান এবং বৃন্দাবনে প্রায় তিনমাস বাস করেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কামারপুকুরে

দুঃখ-বিপদ সব মানুষের জীবনেই আসে। সাধারণ মানুষ যাদের বুদ্ধি বিবেচনা অল্প, তারা প্রাত্যহিক জীবনের সামান্য দুঃখে মুষড়ে পড়ে। কিন্তু খাঁটি সোনা পোড়ালে যেমন মলিন না হয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়, তেমনি দুঃখে-বিপদে মানুষের মত মানুষ যাঁরা, তাঁদের মনের জোর যে কত বেশি, তাঁদের চরিত্র যে কত মহৎ, তাই আরও প্রকাশিত হয়ে পড়ে। মনে হয় তাঁদের, জীবনে বাধা আসে, অভাব আসে, শুধু সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। বিপদে কি রকম করে ধৈর্য ধরে থাকতে হয় তা শেখাবার জন্য। বাধা-বিপত্তিতে তাঁরা হার মানেন না,—আর অক্ষম কাপুরুষ যেমন নিজের সামর্থ্যের অভাবে অনেক কিছু মেনে নেয়, তাঁদের সহিষ্ণুতাও সে ধরনের নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর সারদাদেবীর জীবনে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে। আমরা দেখেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দক্ষিণেশ্বরে গভীর সাধনায় রত, তখন সারদাদেবী কী দুশ্চিন্তায় কী উৎকণ্ঠার মধ্যে কাল কাটিয়েছেন। দুঃখের নিকট শিক্ষালাভ বোধ হয় এতেও তাঁর শেষ হয় নি। তাই দেখি, দক্ষিণেশ্বরে ক'টি বছর পরিপূর্ণ আনন্দের

মাঝে কাটাবার পর, বিশেষ করে বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে, দারুণ অভাব-অনটনের মধ্যে পড়লেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের কর্তারা ঠিক করেছিলেন, তাঁকে যে সাত টাকা মাসোহারা দেওয়া হ'ত, সেই টাকা সারদাদেবীকে দেওয়া হবে। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই, তিনি বৃন্দাবনে থাকতে থাকতে, দুষ্টলোকের চক্রান্তে সে মাসোহারা বন্ধ হয়ে যায়। এই খবর পেয়ে তিনি বলেছিলেন, "এমন সোনার মানুষই চলে গেল, টাকায় আমার কি হবে?" তিনি যতদিন বৃন্দাবনে ছিলেন ততদিন খাওয়া-দাওয়ার খরচ চালাতেন বলরামবাবুরা, অন্যান্য খরচ দিতেন রামকৃষ্ণের দুই শিষ্য। যে সব গৃহস্থ ভক্ত কাশীপুর বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণের খরচ চালাতেন তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, সারদাদেবীর জন্য তাঁরা চাঁদা ক'রে মাসে দশ টাকা দেবেন। কিন্তু তখনও তাঁদের অনেকের সারদাদেবীর প্রতি বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁদের ধারণা হয়েছিল, কামকাঞ্চনত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে বিবাহ একটা অনাবশ্যক ব্যাপার; তাঁর জীবনে সারদাদেবীর কোন প্রয়োজন বা স্থান নাই। তাঁরা যে টাকা দেওয়ার সঙ্কল্প করেছিলেন সেটা গুরুপত্নীকে মান্য করার হিসাবে। তাঁর বৃন্দাবন-বাসকালে তাঁকে সাহায্য করার প্রয়োজন ছিল না। আবার তিনি যখন কামারপুকুরে ফেরেন তখন হয়ত গৃহস্থ ভক্তেরা তাঁর কথা নিয়ে আর মাথা ঘামান নি, বা ভেবেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইপো শ্রীযুত রামলাল তো শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজকের কাজ করে কিছু রোজগার করেন, তিনি নিশ্চয় নিজের খুড়িমার খরচ চালাতে পারবেন। আর যেসব ছোকরা ভক্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের প্রাণের চাইতে বেশি ভালবাসতেন, যাদের আসার জন্য তিনি কতকাল পথপানে চেয়ে কাটিয়েছেন, তারা ত তখন সব ছেড়ে, সব ভুলে সাধনভজনে একেবারে ডুবে রয়েছেন,

তাঁদের নিজেদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই নাই, এক মুঠো নুনভাতও সব দিন তাঁদের জোটে না। সারদাদেবীর অভাবের কথা জানতে পারলে তাঁরা নিশ্চয় ভিক্ষা করে এনে তাঁকে খাওয়াতেন, কিন্তু জগতের কোন খবর যে তখন তাঁদের কানে পৌঁছাত না।

বৃন্দাবন থেকে কলকাতা ফেরার দু'দিন পরে বর্ধমানের পথে তিনি কামারপুকুরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। টাকা-পয়সার অভাবে তাঁকে বর্ধমান থেকে উচালন পর্যন্ত আট ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে যেতে হ'ল। স্বামী যোগানন্দ ও গোলাপ-মা তাঁকে পৌঁছে দিতে গেলেন। স্বামী যোগানন্দ তিনদিন পরে কলকাতায় ফিরলেন, গোলাপ-মা কামারপুকুরে রইলেন একমাস। তাঁরা কামারপুকুরে পৌঁছুতেই সারদাদেবীর বেশভূষা দেখে সেখানকার মেয়েমহলে নানারকম আলোচনা শুরু হ'ল। 'ওমা, এ যে ঘোর কলিকাল, নইলে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের বামুনের ঘরের বিধবা সোনার বালা আর লালপেড়ে ধুতি পরে কোন্ আক্কেলে!' এই ধরনের আলোচনা সারদাদেবীর মনকে চঞ্চল করে তুলল। গোলাপ-মা যে ক'দিন ছিলেন ততদিন তাঁর মুখের ভয়ে কেউ বড় মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস পায় নি। কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা শুনিয়ে শুনিয়ে নানা আলোচনা আরম্ভ করল। সে পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত মেয়েদের আলোচনা এমনি তিক্ত যে, একটুকুতেই মন বিষিয়ে ওঠে। গোলাপ-মা যেদিন চলে গেলেন, সেদিনই তিনি হাতের বালা খুলে রাখলেন। কামারপুকুরে পৌঁছবার পর তাঁর মনের অবস্থা তিনি নিজের মুখে বলেছেন, "উনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) চলে গেছেন, তাতে কামারপুকুরে এসে বুঝতে পারলাম, সংসারের কি অবস্থা। মনে হ'তে লাগল, আর কেন? উনিই যখন চলে গেলেন তখন আর থেকে কি হবে? এই কথা দিন কয়েক মনে হ'তেই একদিন তিনি সামনে দাঁড়িয়ে বললেন,

'ওগো এখন তোমার যাওয়া হবে নি। কলকাতার লোকগুলো অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল কচ্ছে। তাঁদের দেখতে হবে'।" এই ধরনের আদেশ তিনি কাশীপুরেও একবার পেয়েছিলেন। আবার সেই আদেশ পেয়ে বুঝলেন, কলকাতার লোকদের মধ্যে ধর্মভাব দেবার জন্য তাঁকে আরও অনেকদিন বেঁচে থাকতে হবে।

কামারপুকুরে মেয়েদের নিন্দামন্দ শুনে তিনি কি ভেবেছিলেন ও কি করেছিলেন, সে কথা তাঁর নিজের মুখেই শুনি।—"বৃন্দাবন থেকে কামারপুকুরে এলাম। এ ও বলছে, ও তা বলছে। লোকের কথার ভয়ে হাতের বালা খুলে ফেললাম। গোলাপ চলে যেতে ভাবলাম, গঙ্গাহীন দেশে কি ক'রে থাকব? বরাবরই আমার একটা গঙ্গাবাই ছিল। মনে করলাম, গঙ্গাস্নানে যাব। দিন কয়েক বাদে দেখি, সামনের বড় রাস্তা দিয়ে তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) আসছেন ভূতির খালের দিক থেকে। নরেন রাখাল বাবুরাম পিছে পিছে, আরও কত ভক্ত —কত লোক! দেখি কি, ওঁর পা থেকে জলের ফোয়ারা ঢেউ খেলে খেলে আগে আগে আসছে। কী জলের স্রোত! দেখে মনে হ'ল— ইনিই তো সব! এঁর পাদপদ্ম থেকেই তো গঙ্গা! আমি তাড়াতাড়ি রঘুবীরের (শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহদেবতা) ঘরের পাশের জবাগাছ থেকে মুঠো মুঠো ফুল ছিঁড়ে গঙ্গায় দিতে লাগলাম। তারপর তিনি আমায় বললেন, 'হাতের বালা খুলো নি। বৈষ্ণবতন্ত্র জান তো?' আমি বললাম, বৈষ্ণবতন্ত্র কি? আমি তো কিছু জানি না। তিনি বললেন, 'বিকেলে গৌরদাসী আসবে, তার কাছে শুনে নিও।' সেই দিন বিকেলে গৌরদাসী এল। তাকে সব বললাম। সে কত শ্লোক বলে যেতে লাগল। শেষে বুঝিয়ে বললে, 'তোমার যে মা চিন্ময় স্বামী।' আবার বালা পরলাম।" শ্রীরামকৃষ্ণের বিদুষী সন্ন্যাসিনী শিষ্যা এই গৌরদাসী গৌরীপুরী দেবী বা গৌরী-মা নামে বিশেষ পরিচিতা।

মেয়েরা সহজে শান্ত হবার নয়। তারা গ্রামের জমিদার ধর্মদাস লাহার বিধবা দিদি প্রসন্নময়ীর কাছে গিয়ে সারদাদেবীর নামে নালিশ করল। শ্রীরামকৃষ্ণের ছেলেবেলা থেকেই তাঁর উপর প্রসন্নময়ীর খুব ভক্তি। সন্ন্যাস নেবার আগে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম গদাধর ছিল বলে প্রসন্নময়ী এবং গ্রামের অনেকে তাঁকে আদর করে গদাই বলে ডাকতেন। মেয়েদের নালিশ শুনে তিনি হু'হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "গদাইএর বউ, এরা দেবাংশী—সাধারণ লোক নয়।" জমিদারের দিদির ভক্তি দেখে মেয়েদের কানাঘুষা অনেকটা কমে গেল।

গালমন্দ শোনার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে না হয় একটি কষ্ট গেল; কিন্তু টাকা-পয়সার অভাবটি বড় ভীষণভাবে দেখা দিল। তিনি রঘুবীরের জমির মজুত ধান থেকে চাল তৈরি করালেন, কিন্তু সৈন্ধব লবণ কেনার মত পয়সাও যে তাঁর জোটে না। কাশীপুরের বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তাঁকে বলেছিলেন, "এরপর (অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর) তুমি কামারপুকুরে থাকবে, শাক বুনবে। শাকভাত খাবে আর হরিনাম করবে।" মনে হয় লোকশিক্ষার জন্য একথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাওয়ার দরকার ছিল। কামারপুকুরে এসেই তিনি বুঝলেন, তাঁকে কি করতে হবে। নিজের হাতে কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে তিনি শাকের চাষ করলেন। যতদিন শাক খাবার উপযুক্ত না হ'ল ততদিন শুধু ভাতই রঘুবীরকে ভোগ দিলেন। শাক বড় হ'লে শাকসিদ্ধ ভাত ঠাকুরকে নিবেদন ক'রে প্রসাদ পেতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর এই দৈন্যের কথা কাউকে জানালেন না বা জানতে দিলেন না। তিনি যদি ইঙ্গিতেও তাঁর অভাবের কথা শ্রীরামকৃষ্ণের মেয়েভক্তদের মধ্যে—বলরামবাবুর স্ত্রী, গোলাপ-মা বা যোগেনমা—এঁদের কাউকে জানাতেন ত তাঁর অভাব সঙ্গে সঙ্গে

ঘুচে যেত। কিন্তু ত্যাগীর শিরোমণি শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁর জীবনের আদর্শ, তিনি নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অপরের কাছে হাত পাততে পারলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাঁকে শিখিয়েছিলেন, "দেখ, কারও কাছে একটা পয়সার জন্যও চিৎ হাত করো না; তোমার মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না। একটা পয়সার জন্যও যদি কারও কাছে হাত পাতো তবে তার কাছে মাথাটি কেনা হবে থাকবে।"

সারদাদেবী কামারপুকুরে এসেছেন শুনে শ্যামাসুন্দরী দেবী তাঁর এক ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন মেয়েকে জয়রামবাটী নিয়ে যাবার জন্য। ভাইয়ের সঙ্গে না গিয়ে তিনি কিছুদিন পরে গেলেন। তাঁর ভিখারিণীর বেশ দেখে শ্যামাসুন্দরী কাঁদতে লাগলেন। কয়েকদিন পরে তিনি কামারপুকুরে ফেরার উদ্যোগ করলে তাঁর মা তাঁকে অনেক করে বললেন তাঁর কাছে গিয়ে থাকবার জন্য। উত্তরে তিনি শুধু এইটুকু বললেন, "এখন তো কামারপুকুরে যাচ্ছি। এরপর তিনি যা করাবেন তাই হবে।"

কামারপুকুরে তিনি ফিরলেন। মনে তাঁর নানা ভাবনা; তাঁর মায়ের কাতরতা তাঁর ভাবনার পরিমাণ বাড়িয়ে তুলেছে। তখনকার মনের অবস্থা তিনি এইভাবে প্রকাশ করেছেন—"ঠাকুর চলে গেছেন। একা একা ভাবতাম—ছেলে নেই, কিছু নেই, কি হবে? আরও কত কি যে মনে আসত। একদিন তিনি দেখা দিয়ে বললেন, 'কেন ভাবছ গো? তুমি একটা ছেলের কথা ভাবছ, আমি এত সব রত্ন ছেলে দিয়ে গেলাম, এরাই তোমায় দেখবে। কালে আরও কত লোকে তোমায় 'মা' বলে ডাকবে। তখন দেখো, ছেলের আবদারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠো না যেন'।"

তাঁর দৈন্যের কথা খুব বেশিদিন গোপন রাখতে পারলেন না। তাঁকে প্রায় একা একা থাকতে হ'ত বলে তিনি প্রসন্নময়ীকে অনুরোধ

করেছিলেন, এক বুড়ী ঝিকে রাতের বেলা তাঁর কাছে শোবার জন্য পাঠিয়ে দিতে। সেই বুড়ীর কাছ থেকেই তাঁর অভাবের কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ল। খবরটা জয়রামবাটীতে শ্যামাদেবীর কানে গেল। তিনি কন্যার ভবিষ্যৎ ভেবে আকুল হলেন। একটা কিছু ব্যবস্থা করার জন্য তাঁর বড় ছেলে প্রসন্নকুমারকে খবর পাঠালেন। প্রসন্নকুমার তখন কলকাতায় পুরোহিতের কাজ করতেন।

প্রসন্নকুমার দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শ্রীযুত রামলালকে খুব একচোট নিলেন এবং ফিরবার পথে গোলাপ-মা'র সঙ্গে দেখা ক'রে বেশ কড়া কড়া দু'চার কথা শুনিয়ে এলেন, 'তোমরা থাকতে তোমাদের মায়ের ভাতে নুন জুটছে না যে' এবং এই ধরনের আরও কত কথা। গোলাপ-মা শ্রীরামকৃষ্ণের পুরুষভক্তদের অন্দরমহলে ঘুরে ঘুরে টাকার চেষ্টা করতে লাগলেন, যাতে সারদাদেবীকে কলকাতায় এনে রাখা যায়। অবিলম্বে দরকারমত টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। তখন মেয়েভক্তরা সবাই সারদাদেবীকে কলকাতায় এসে থাকার জন্য অনুরোধ করে পত্র লিখলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যগণও কলকাতায় আসার জন্য তাঁকে কাতর মিনতি জানালেন।

এই খবর পেয়ে কামারপুকুরে মেয়েরা আবার নানা কথা বলাবলি আরম্ভ করল। সারদাদেবী তখন প্রসন্নময়ীর মত জানবার চেষ্টা করলেন সেই বুড়ী ঝিকে দিয়ে। ভক্তিমতী প্রসন্নময়ী ঝিকে বললেন, "গদাইএর শিষ্যরা ত বৌএর ছেলে। তারা যখন তাদের মাকে নিয়ে যেতে চাইছে তখন বৌএর যাওয়াই উচিত।" ঝি—"গ্রামের মেয়েরা যে ছি ছি করছে।" প্রসন্নময়ী—"ওরা গদাইএর বৌএর কি জানে? সে যে মা, তাকে যে যেতেই হবে। ওরা কি বলছে-না-বলছে সে আমি বুঝব।'

সারদাদেবী জানতেন, কামারপুকুরে প্রসন্নময়ীর প্রভাব কত। কাজেই অনেকটা আশ্বস্ত হ'লেন। কিন্তু জয়রামবাটীর লোকে কি বলে, তাঁর মা শ্যামাসুন্দরীরই বা মত কি, তাও তো জানা দরকার। এই উদ্দেশ্যে তিনি একদিন জয়রামবাটী গেলেন। তাঁর যাওয়ার আগেই সংবাদটা সেখানে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। সেখানকার সকলে তাঁর কলকাতায় যাওয়া বেশ সমর্থন করেছেন দেখে তিনি আশ্বস্ত হলেন। কলকাতায় ভক্তদের তিনি জানিয়ে দিলেন—তিনি কলকাতায় যেতে রাজী, যদি তার ফলে কারও কোন কষ্ট না হয়।

মেয়েভক্তরা তাঁদের সাধনপথে একজন সহায়কের বিশেষ অভাব বোধ করছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পাওয়া যে সাধনার বীজ তাঁদের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়েছিল, উপযুক্ত যত্নে তাকে বাড়িয়ে ফলে ফুলে সুশোভিত করার জন্য তাঁদের প্রয়োজন হয়েছিল সারদাদেবীকে নিজেদের মধ্যে পাওয়ার। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর আর কে সে কাজে তাঁদের সাহায্য করবে! তাই বিশেষভাবে মেয়েভক্তদের আগ্রহে সারদাদেবীর কলকাতায় বাসের সব ব্যবস্থা হ'ল।

১২৯৪ সালের শেষভাগে ভক্তরা তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। কলকাতায় এসে প্রথমে তিনি বলরামবাবুদের বাড়িতে উঠলেন। বৃন্দাবনে যাঁরা সঙ্গী ছিলেন তাঁরা দেখলেন, তাঁর অবস্থা বদলে গেছে, সে বালিকার ভাব আর নেই। ধীর স্থির গম্ভীর মূর্তি, তাঁর রূপের ছটায় যেন চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ধ্যানে বসলেই তাঁর দেহজ্ঞান, জগতের জ্ঞান লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

এই থেকে তাঁর কলকাতায় যাতায়াত শুরু হ'ল। যতদিন তিনি সশরীরে ছিলেন, তার প্রায় অর্ধেক সময় কাটিয়েছেন জয়রামবাটীতে এবং অর্ধেক সময় কলকাতায়। প্রথমবারের পর বোধ হয় আর একবার মাত্র তিনি বেশিদিনের জন্য কামারপুকুরে বাস করেছেন।

কলকাতায় প্রথম প্রথম অল্প সময়ের জন্য এলে শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ি বা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত-লেখক 'মাস্টার মশায়ের' বাড়ি থাকতেন। আর যখন বেশি সময় থাকতেন তখন গঙ্গার তীরে তাঁর জন্য বাড়িভাড়া করে দেওয়া হ'ত। অবশেষে স্বামী সারদানন্দের চেষ্টায় সন ১৩১৬ সালে কলকাতায় বাগবাজারে তাঁর বাসের জন্য বাড়ি তৈরি হয়। এই বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বাংলা মুখপত্র উদ্বোধনের অফিস স্থাপিত হয়। ভক্তদের নিকট এই বাড়িটি 'মায়ের বাড়ি' নামে পরিচিত।

চতুর্দশ অধ্যায়

গয়া ও পুরীধাম দর্শন

একে গঙ্গাতীর, তায় জায়গাটা ভারী নির্জন। সেখানে কিছুকাল মনের আনন্দে সাধনভজনে কাটিয়ে সারদাদেবী গয়াক্ষেত্রে যাবার উদ্যোগ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যে সকল তীর্থস্থান দর্শন করেন নি সেই সকলের কতকগুলির নাম করে তিনি একদিন সারদাদেবীকে বলেছিলেন ঐগুলি দর্শন করার জন্য; বিশেষ করে গয়াক্ষেত্রে গিয়ে চন্দ্রমণিদেবীর আত্মার কল্যাণের জন্য বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদানের জন্য তাঁকে আদেশ করেছিলেন। সারদাদেবী ঐ পুণ্যতীর্থে গিয়ে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি যথানিয়মে করলেন। সেখানে বাসের সময় একদিন বুদ্ধগয়া দর্শনে গিয়েছিলেন। তপস্যার শেষে সিদ্ধার্থ এখানে পূর্ণজ্ঞান লাভ করে 'বুদ্ধ' রূপে পরিচিত হন। এখানকার মঠের ঐশ্বর্য দেখে তাঁর কোমল প্রাণ ব্যথিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বত্যাগী যুবক সন্ন্যাসী শিষ্যগণের অন্নবস্ত্রের অভাবের কথা স্মরণ করে; তিনি আকুল-ভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, ঐ আত্মভোলা সন্তানগণের

মাথা গুঁজবার মত একটা স্থানের জন্য। ঠাকুর তাঁর ঐ প্রার্থনা শুনেছিলেন—ঐ প্রার্থনার ফলে বেলুড় মঠ স্থাপিত হয়েছিল, একথা তিনি পরে অনেকবার বলেছেন।

গয়া থেকে ফিরে গিয়ে তিনি বেলুড়ে নিলাম্বরবাবুর ভাড়াটে বাড়িতে বাস করতে গেলেন। সঙ্গে আগেকার সেই তিনজন সেবক-সেবিকা।

নীলাম্বরবাবুর বাগানে মাস ছয়েক বাসের পর সারদাদেবী কয়েকজন পুরুষ ও স্ত্রীভক্তের সঙ্গে পুরীধামে যাত্রা করেন। উড়িষ্যার অন্তর্গত কোঠারে শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত বলরাম বসুদের জমিদারী ছিল। তাঁরা প্রথমে কোঠারে গিয়ে ওঠেন। আজকাল তো পুরী যাওয়া কিছুই নয়। এখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও তাদের বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দক্ষিণে পশ্চিমে কত দূর-দূরান্তর তীর্থভ্রমণ করে আসছে। কিন্তু এদেশে যখন রেল স্টীমার মটরগাড়ির প্রচলন হয় নি, তখন তীর্থভ্রমণ যে কি কষ্টসাধ্য ছিল তা কল্পনা করাও শক্ত। তখন যাঁরা পায়ে হেঁটে তীর্থদর্শনে যাত্রা করতেন তাঁরা আবার ফিরে আসার আশা ত্যাগ করে সকলের কাছে বিদায় নিতেন। দুর্গমপথে চোর, ডাকাত, রোগ বিশুদ্ধ খাদ্য ও জলের অভাব ইত্যাদি বিপদের তো অন্ত ছিল না।

সারদাদেবী যখন পুরী যান তখন সব রাস্তাটা হেঁটে না গেলেও চলত। জাহাজে চড়ে সমুদ্রে গেলে যাদের জাত যাবার ভয় ছিল না তাঁরা কলকাতা থেকে উড়িষ্যার চাঁদবালি বন্দর পর্যন্ত জাহাজে যেতে পারতেন। চাঁদবালি থেকে কটক পর্যন্ত ছোট স্টীমার যাতায়াত করে। সারদাদেবীর সঙ্গীরা তাঁকে এই পথে নিয়ে গিয়েছিলেন।

কটক শহর মহানদীর তীরে। মহানদী পার হওয়ার পর পুরী যাওয়ার তিনটি উপায় ছিল। প্রথম, বেশ টাকাপয়সা খরচ করতে পারলে পালকি চড়ে যাওয়া; দ্বিতীয়, গরুর গাড়িতে যাওয়া; আর

তৃতীয় উপায়, পায়ে হেঁটে যাওয়া। নদী পার হওয়ার পর দুখানা গরুর গাড়ি যোগাড় করা হ'ল। একখানিতে উঠলেন সারদাদেবী আর অন্যখানিতে যোগেন-মা ও গোলাপ-মা। বাকী সব সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ ভক্তরা চললেন পায়ে হেঁটে গরুর গাড়ির পিছনে পিছনে—'জয় জগন্নাথ, জয় মহাপ্রভু' ধ্বনি করতে করতে।

ভোর হ'তে না হ'তে তাঁরা উঠে প্রাতঃকৃত্য সব সেরে, সামান্য জলযোগ করে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন তীর্থদেবতার নামে জয়ধ্বনি দিয়ে। দুপুরে কোন চটিতে বা জলাশয়ের ধারে গাছের তলায় বিশ্রাম করতেন। রান্না করা যে মহা ঝঞ্ঝাট, তাতে অনেক সময় যায়! স্নানের পর চিঁড়া গুড় প্রভৃতি দিয়ে তাঁরা মধ্যাহ্নভোজন সমাধা করতেন। তারপর আবার তাঁদের চলা শুরু হ'ত। সন্ধ্যার আগে কোন চটিতে এসে তাঁরা আশ্রয় নিতেন এবং রান্না করে খেতেন। কটক থেকে পুরীধামের দূরত্ব খুব বেশি নয়, ষাট মাইলের মধ্যে। কাজেও তীর্থযাত্রীদের এই ধরণের পথের ক্লেশ আমাদের যাত্রীদলকে তিন-চারদিনের বেশি ভোগ করতে হয় নি।

এই সেই জগন্নাথধাম। কত ইতিহাস, কত কাহিনী আছে এই নামের সঙ্গে জড়িয়ে। এখানকার মন্দির, এখানকার রথ সারা ভারতের অধিবাসীদের অন্তরে জাগিয়ে তোলে অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি, বিদেশী বিধর্মী বিশ্ববাসীর মনে জাগায় এক অপূর্ব বিস্ময়। ভারতের শ্রেষ্ঠ আচার্যগণ এসেছেন এই পুণ্যক্ষেত্র দর্শন করতে। আচার্য শঙ্কর এখানে করেছেন জ্ঞানের মহিমা বিস্তারে, আচার্য রামানুজ এসেছেন ভক্তির প্রাধান্য স্থাপনে। আবার বাংলা মায়ের স্নেহের দুলাল শ্রীগৌরাঙ্গদেব এর পথে পথে হরিপ্রেম বিতরণ করে, দীর্ঘকাল এই পুণ্যতীর্থে বাস করে উড়িষ্যাবাসীকে কৃতার্থ করেছেন। আর আজ এসেছেন এযুগের মানুষকে যিনি বিবেক বৈরাগ্য ও

সমন্বয়ের বাণী শোনাতে বাংলাদেশে শরীর ধারণ করেছিলেন সেই শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী ও তাঁর প্রিয় শিষ্যগণ। এই পুণ্যক্ষেত্রে উপস্থিত হবার পর তাঁদের প্রাণে ভাব-ভক্তির কত উচ্ছ্বাস যে উঠতে লাগল সে কথা কে বর্ণনা করতে পারবে।

ক্ষেত্রবাসীর মঠে জিনিসপত্র রেখে তাঁরা ধুলোপায়ে জগন্নাথ দর্শনে চললেন। লক্ষ শালগ্রামশিলার বেদীর উপর জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি। সারদাদেবী দেখলেন যেন পুরুষসিংহ বসে আছেন।

তাঁরা পুরীধামে যাঁর অতিথি হয়েছিলেন, তাঁর সেখানে ছিল খুব প্রতিপত্তি। সারদাদেবীর উপর তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি দেখে মন্দিরের পাণ্ডা গোবিন্দ সিংগারীরও ইচ্ছা হ'ল তাঁকে বিশেষ খাতির করার। পাণ্ডাঠাকুর তাঁকে পালকিতে করে মন্দিরে নিয়ে যেতে চাইলেন, কিন্তু তিনি বললেন, "না গোবিন্দ, তুমি আমায় মন্দিরে নিয়ে চল। আমি তোমার পিছনে পিছনে অনাথ ভিখারিণীর মত জগতের স্বামীকে দেখতে যাব।"

পুরীতে তাঁরা অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ছিলেন। সারদাদেবী প্রথম প্রথম দু'বেলাই মন্দিরে যেতেন। পরে নিত্য বিকালে যেতেন ও আরতি দেখতেন। প্রতিদিন অনেকখানি সময় তাঁরা জপধ্যানে কাটাতেন।

সন ১৩০৮ সালে তিনি আর একবার পুরীধাম দর্শন করেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

স্বজন-সঙ্গে

বৃন্দাবন থেকে ফিরে সারদাদেবী প্রায় একবৎসরকাল কামারপুকুরে কাটান। এরপর তাঁর জীবনের অবশিষ্টকালের প্রায় অর্ধেক কলকাতায় এবং অর্ধেক জয়রামবাটীতে যাপন করেছেন। কামারপুকুরে

বাস না করে তিনি জয়রামবাটীতে গিয়ে থাকতেন কেন? এর দুটো কারণ। প্রথম, কামারপুকুরে তাঁকে প্রায় একা একা থাকতে হ'ত; তাঁকে দেখাশুনার, তাঁর কাজেকর্মে সাহায্য করার কেহ ছিল না। অন্যপক্ষে জয়রামবাটীতে তাঁর ভাইরা সব রকমে তাঁর সাহায্যে বিশেষ প্রত্যাশী ছিলেন। তাই তাঁকে মাঝে মাঝে জয়রামবাটীতে যেতে হ'ত। নচেৎ কামারপুকুর গ্রামের উপর তাঁর যথেষ্ট টান ছিল। এ গ্রামকে তিনি নিজের গ্রাম মনে করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে একসময় বলেছিলেন, "বরং পরভাতা ভাল, কিন্তু পরঘরো ভাল নয়। তোমাকে ভক্তরা যে যেখানেই নিজেদের বাড়ি আদর-যত্ন করে রাখুক না কেন, কামারপুকুরের নিজের ঘরখানি কখনও নষ্ট করো না।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এ আদেশ তিনি আজীবন পালন করেছেন। কামারপুকুরের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরখানি তিান বরাবর টাকা খরচ করে মেরামত করিয়ে রাখতেন, যদিও সে ঘরে তাঁর থাকার দরকার ছিল না।

সারদাদেবীকে জগৎ জানছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী হিসাবে, তাঁরই ন্যায় শক্তিশালী লোকগুরুরূপে। সে সম্বন্ধে অনেক কথা পরে হবে। আপাততঃ তাঁর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের, তাঁর সাংসারিক জীবনের বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক। যে বিচিত্র ও বিরুদ্ধ পারিবারিক অবস্থার মধ্যে তিনি কাল কাটিয়েছেন, সে কথা ভাবলে তাঁর মহত্ব আমাদের মনকে অভিভূত করে ফেলে। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও ব্যবহার তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনকে লোকচক্ষুর সম্মুখে এক অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত করে ফুটিয়ে তুলেছে।

সারদাদেবী মাতাপিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন। গরীবের সংসারে বড় বোনকে ছোট ভাইবোনেদের অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়। প্রসন্নকুমার, বরদাপ্রসাদ, কালীকুমার ও অভয়চরণ এই ছোট ভাই

চারিটিকে সারদাদেবী কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন। তাঁদের উপর তাঁর একটা গভীর ভালবাসা ছিল। ভাই ক'টি সকলেই ছিলেন সাধারণ সংসারী মানুষ—দৈববিড়ম্বনায় সারদাদেবীর আধ্যাত্মিক বা নৈতিক কোন গুণের বিকাশ এই ভাইদের মধ্যে দেখা যায় নি। বরং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন ঘোর সংসারী। ছোট ভাইটির ছাড়া অপর কারও বুদ্ধি বিশেষ প্রখর ছিল না, লেখাপড়াও তাঁরা বিশেষ কিছু শেখেন নি। একমাত্র ছোট ভাই অভয়চরণ কলকাতায় ডাক্তারী স্কুল থেকে পাশ করেন।

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁর সংসারে খুব অনটন হয়েছিল। শ্যামাসুন্দরীকে লোকের বাড়ি থেকে ধান এনে কুটে দিয়ে তার আয় থেকে সংসার চালাতে হয়েছে। দক্ষিণেশ্বরে থাকার সময় সারদাদেবী যখন জয়রামবাটী যেতেন তখনও তিনি তাঁর মাকে ধানভানা ও আর সবরকম সাংসারিক কাজে সাহায্য করতেন। পরে যখন কলকাতা থেকে সেখানে যেতেন তখন ভাইদের সংসারের অধিকাংশ কাজ নিজের হাতে করে দিতেন। বুড়ী মাকে তিনি খাটতে দিতেন না। আর বৌগুলিও সব ছিল ছোট ছোট। তাদের ছোট ছেলেমেয়েদের যত্ন দেওয়া, ধান সিদ্ধ করা ও ধানভানা, এসব কাজ তিনি নিজে করতেন।

বড় হয়েও ভাইরা সারদাদেবীর উপর খুব নির্ভরশীল ছিলেন। তবে দিদির উপর তাঁদের ভালবাসার কমতি বাড়তি নির্ভর করত দিদির নিকট পাওয়া টাকাপয়সার পরিমাণের উপর। পরবর্তীকালে ভক্তরা যখন তাঁর সেবার জন্য টাকাকড়ি দিতেন তখন এই ভাইদের সব সময় নজর থাকত, কে কতটা আদায় করতে পারেন। এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে হিংসা দ্বেষ ও বিরোধের অন্ত ছিল না। তাঁদের ঝগড়া-ঝাঁটি তাঁকে সময় সময় ব্যতিব্যস্ত করে তুলত। সন ১৩১৩ সালে

শ্যামাসুন্দরীর মৃত্যুর পর তিনি যখন দেখলেন যে ভাইদের আর কিছুতেই এক সংসারে রাখা যায় না, তখন তিনি তাঁদের বিষয় ভাগ করে দেবার ব্যবস্থা করলেন। এরপর যতদিন না ভক্তরা জয়রামবাটীতে তাঁর বাসের জন্য ঘর তৈরি করে দিয়েছিলেন ততদিন তিনি ভাইয়েদের সংসারে, বিশেষ করে প্রসন্নকুমারের বাড়িতে থাকতেন।

ভাইদের পৃথক করে দিয়েও রক্ষা ছিল না ; তাঁদের টাকাপয়সার তাগাদায় তাঁকে সমানভাবে জ্বালাতন হ'তে হয়েছে। তাঁদের দাবীতে বিরক্ত হয়ে একদিন তিনি বলেছিলেন, "এরা দিনরাত কেবল টাকা চায়। ভুলেও কি কখনও এদের জ্ঞান-ভক্তি চাইতে নেই ?"

সারদাদেবী একদিন সকালে তাঁর ঘরের বারান্দায় বসে আছেন। এমন সময় বরদাপ্রসাদ ও কালীচরণের মধ্যে কোন কারণে বচসা হ'তে হ'তে মারামারি হবার উপক্রম। তিনি স্থির থাকতে না পেরে দুই ভাইয়ের কাছে গেলেন। কখনও একজনকে বলছেন, 'তোর অন্যায়' ; কখনও আবার অপরকে ধরে টানছেন। খুব মেতে গিয়েছেন। কিছু পরে কয়েকজন লোক এসে ভাইদের ছাড়িয়ে দিলেন—তাঁরা বকাবকি করতে করতে নিজেদের বাড়িতে ঢুকলেন। সারদাদেবীও নিজের বাড়িতে এসে বসে পড়লেন—খুব রেগে গেছেন। কিন্তু বসেই হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন, "মহামায়ার কি মায়া গো! অনন্ত পৃথিবী পড়ে আছে, এও (যে বিষয়কে 'আমার আমার' করি) পড়ে থাকবে—জীব এইটুকু আর বুঝতে পারে না।" এই বলে হেসে অস্থির—সে হাসি আর থামে না।

ভাইদের সংসারে থেকে তিনি এই রকম জ্বালাতন হ'তেন। কিন্তু এইটুকু সব নয় ; আরও ঢের বেশি ঝঞ্ঝাট তাঁকে পোহাতে হয়েছে। তাঁর ছোট ভাই অভয়চরণ মারা যান ডাক্তারী পাস করার পরেই। অভয়চরণের স্ত্রী সুরবালা তখন প্রথম গর্ভবতী। অভয়চরণ দেহত্যাগের

পূর্বে দিদিকে সুরবালা ও তার গর্ভস্থ সন্তানের ভার নিতে অনুরোধ করেন। স্বামীর ও আরও দু'জন নিকট আত্মীয়ার মৃত্যুর জন্য দারুণ শোক সহ্য করতে না পারায় সুরবালার মাথা খারাপ হয়ে যায়। এই অবস্থায় এক কন্যা প্রসব করার পর সুরবালার পাগলামি আরও বেড়ে যায়। নবজাত শিশুটিকে কি করে মানুষ করা যাবে, বাড়ির সকলের পক্ষে সেটা এক মহাসমস্যা হয়ে দাঁড়াল। সারদাদেবী শিশুটির সেবাযত্নের জন্য এক মহিলাকে নিযুক্ত করে কলকাতায় চলে আসেন। বালিকাটির নাম রাখা হল রাধারাণী—ডাকনাম রাধু বা রাধি।

কলকাতায় এসে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। মানসচক্ষে দেখলেন, পাগলী মায়ের হাতে রাধুর অশেষ দুর্গতি হচ্ছে। তিনি অল্পদিনের মধ্যে জয়রামবাটী ফিরে গিয়ে রাধুর লালনপালনের ভার নিজের হাতে নিলেন। এই থেকে দেহত্যাগের অল্পদিন পূর্ব পর্যন্ত এই রাধুর চিন্তা তাঁর মনের অনেকখানি স্থান জুড়ে থাকত। রাধুর সেবা, রাধুর যত্ন, রাধুর ভবিষ্যৎ ভাবনা প্রভৃতিতে তাঁকে প্রায় ব্যস্ত থাকতে দেখা যেত। রাধুকে তিনি কিছুতে কাছ-ছাড়া করতে পারতেন না। রাধু ছাড়া তাঁর আহারে রুচি হ'ত না, রাধু পাশে না শুলে তাঁর ঘুম হ'ত না। সুরবালা ও রাধারাণীর কাছ থেকে সারদাদেবীকে অমানুষিক যন্ত্রণাও সহ্য করতে হয়েছে। সেকরম যন্ত্রণা সত্ত্বেও ভালবাসতে জগতে কখনো কাউকে দেখা যায় না।

রাধুকে ভালবাসতেন বলে তাঁর উপর সুরবালার খুব হিংসা ছিল। পাগলীর মনে সর্বদাই ভাবনা—তিনি বুঝি তার মেয়েটির কি সর্বনাশ করেন! অসুখের সময় রাধুকে খাওয়ালে পাগলী ভাবত, তিনি বুঝি তাকে বিষ খাইয়ে মারবার যোগাড়ে আছেন। এই সব ভেবে সে দিনরাত সারদাদেবীকে গাল মন্দ করত। একদিন সে উনুন থেকে একটা জ্বলন্ত মোটা কাঠ নিয়ে সারদাদেবীকে মারতে ছুটেছিল।

অপরে এসে পাগলীকে ধরে না ফেললে সেদিন সুরবালার হাতে তাঁর যে কী দুর্দশা হ'ত তা কে জানে।

রাধুও ছিল আধা-পাগলী—চিররোগা অবাধ্য খিটখিটে খামখেয়ালী আদুরে। তার বুদ্ধি-বিবেচনা ছিল খুব অল্প। শেষ বয়স পর্যন্ত তার মনের বৃত্তিসকল ভালভাবে ফুটে ওঠে নি। সারদাদেবীর অপরিসীম ভালবাসা তাকে কিছুমাত্র শোধরাতে পারে নি। সকল আবদার সঙ্গে সঙ্গে পূরণ করতে না পারলে, সে রেগে আগুন হয়ে যেত, অকথ্য ভাষায় গালাগালি করত এবং হাতের কাছে যা পেত তাই ছুঁড়ে মারত। বয়স বাড়লেও তার স্বভাব বিশেষ বদলায় নি।

সারদাদেবী তার বিয়ে দেওয়ালেন। কিন্তু সে কিছুতেই শ্বশুরবাড়িতে যাবে না। কাজেই সারদাদেবীকে তার স্বামীকেও আশ্রয় দিতে হ'ল। প্রথম গর্ভসঞ্চারের পর সে প্রায় উন্মাদ হয়ে গেল। তার শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। সন্তান প্রসবের পর তার নড়নচড়নের শক্তি বিশেষ রইল না। এই অবস্থায় তার অভাবের আবদারের অন্ত নাই। সারদাদেবী হাসিমুখে সব সহ্য করতেন—তার সব অভাব পূরণ করতেন। কিন্তু তিনি তো কারও কাছে নিজের জন্য হাত পাততে পারেন না—শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাঁকে নিষেধ করেছেন। রাধুর উৎপাতে ত্যক্ত হয়ে একদিন তিনি বড় দুঃখে বলেছিলেন, "হ্যাঁগা, আমি তার কাছে (এক ভক্তের কাছে, যিনি অনেক টাকা দিচ্ছিলেন এবং আরও বেশি দরকার হ'লে জানাতে বলেছিলেন) কি করে টাকা চাইব? ঠাকুর, তোমার শেষ আদেশটি কি রক্ষা করতে পারব না? দেখ্ রাধি, তোর জন্য আমি সব খোয়াতে বসেছি। ঠাকুর বলেছিলেন, 'দেখ, কারও কাছে একটা পয়সার জন্য চিৎ হাত করো না....'।"

তিনি কলকাতাতে এলেই সুরবালা এবং রাধারাণী তাঁর সঙ্গে

আসত। এরা ছাড়া তাঁর আর দু'টি ভাইঝি সব সময় তাঁর সঙ্গে ফিরত। এদের একজনের বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না, আর একজনের স্বামীর অবস্থা ভাল ছিল না। আর দেশে গেলে তো ভাইরা ছিলেনই। তাঁদের একমাত্র চেষ্টা ছিল, দিদির কাছ থেকে কে কতটা সুখসুবিধা আদায় করে নিতে পারেন। এই ধরনের সব আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বাস করে এবং তাদের জন্য দিনরাত রকমারি ঝঞ্ঝাট সহ্য করেও তিনি কি রকমে সব সময় স্থির শান্ত থাকতেন, সে কথা ভাবলে অবাক হ'তে হয়। বাইরে থেকে তাঁকে দেখলে মনে হ'ত তিনি একজন ঘোর সংসারী—নিজের ছেলেপুলে না হলে কি হয়, অপরের ছেলের মায়ায় বাঁধা পড়েছেন। তাঁর কোন কোন প্রিয় ভক্ত অনেক সময় তাঁর আচরণের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করত, "আপনার কেন এত আসক্তি? রাতদিন 'রাধি রাধি' করছেন ঘোর সংসারীর মত! আপনার শেষে ভরত রাজার দশা হবে। ভরত রাজা মরণের সময় তাঁর প্রিয় হরিণের কথা ভেবে পরজন্মে হরিণ হয়েছিলেন।" "আমরা বাছা, মেয়েমানুষ; ছেলেপুলেদের ভালবাসাটাই আমাদের স্বভাব" এই বলে তিনি অনেক সময় কথাটা হেসে উড়িয়ে দিতেন। একদিন কিন্তু তিনি একজনকে বলেছিলেন, "তুমি এরকম কোথায় পাবে? আমার মত একটি বের কর দেখি? কি জান, যারা পরমার্থ খুব চিন্তা করে, তাদের মন যা ধরে সেটাকে খুব আঁকড়ে ধরে। তাই আসক্তির মত মনে হয়। বিদ্যুৎ যখন চমকায় তখন সারশিতেই লাগে, খড়খড়িতে লাগে না।"

কথাটা হচ্ছে এই—কোন রকমের কামনা বাসনা থাকতে মানুষের মুক্তি হয় না। যাঁরা এই জীবনে ভগবান লাভ করেন তাঁদের সব বাসনা ক্ষয় হয়ে যাওয়ার জন্য বেশি দিন মানুষশরীরে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। অতীতকালের সৎকর্মের ফল যতদিন ফলতে থাকে

ততদিন শরীর থাকে। তবে তাঁদের নিজেদের সুখের, ভোগের কোন বাসনা না থাকলেও অনেক সময় তাঁদের কেউ কেউ জগতের কল্যাণের জন্য মানুষদেহে মানুষের মাঝে থাকতে চান। তাঁরা নিজেরা সব দুঃখের হাত এড়িয়েছেন ; তাঁরা চান, অপরেও দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাক্। কিন্তু মুক্তির পর মানুষদেহে থাকতে হলে কোন রকম একটা কামনা বাসনা আশ্রয় করে থাকতে হয়। মন যাতে সব সময় ভগবানের ধ্যানে ডুবে না থাকে, তার জন্য সাধারণ কোন একটা চিন্তা কোন কাজকর্ম আশ্রয় করে থাকার দরকার পড়ে।

এ কথা শুনে অনেকে হয়ত বলবেন, যত সব আজগুবী কাহিনী। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সারদাদেবীর আচরণের এই রকম ব্যাখ্যা হয়ত অনেকের মনে লাগবে না। তাঁরা বলবেন,—নিজের ছেলেপুলে না থাকলে কি হয়, সংসারের উপর টান যাবে কোথায় ? শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন না,—মহামায়ার এমনি মায়া যে, বালবিধবাকে দিয়ে বেড়াল পুষিয়ে সংসার করিয়ে নেন! সারদাদেবীরও তাই হয়েছিল আর কি—না করে পারতেন না বলেই পরের মেয়েকে মানুষ করে, আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে অত জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করছেন।

কথাটা বড় তুচ্ছ নয় ; তবে তাঁর জীবনের আর সব আচরণ, তাঁর চরিত্রের প্রভাব—এসবের সঙ্গে কথাটা মিলিয়ে দেখতে হবে তো ? যে লোকের নিজের সংসারের উপর খুব আসক্তি আছে তাঁর সংস্রবে যারা আসবে তাদের আসক্তি আরও বাড়বার ষোল আনা সম্ভাবনা। তিনি আবার অপরের আসক্তি ঘোচাবেন কি করে! এক অন্ধ কি অপর অন্ধকে পথ দেখাতে পারে ? কিন্তু সারদাদেবীর জীবনে দেখি, তাঁর সংস্রবে এসে হাজার হাজার লোকের বিষয়ের উপর আসক্তি ঘুচে গেছে ; তাঁর প্রভাবে পড়ে কত লোক ঘরবাড়ি, আত্মীয়স্বজন, বিষয়-সম্পদ, মানযশ—সব কিছুর উপর মমতা চিরদিনের মত ত্যাগ করে

ভগবান লাভের জন্য পথের ভিখারী হয়েছেন। তাঁর নিজের মনে কোন রকম আসক্তি থাকলে এটি সম্ভব হ'ত না।

ভাইদের জন্য যা করেছেন তার প্রতিদানে কিছু পাবেন তার সম্ভাবনা বা সেরকম আশার লেশমাত্র তাঁর মনে কোনদিন ছিল না। আর পাগলী সুরবালা আধা-পাগলী রাধারাণীর কথা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। তাদের যথাশক্তি সেবাযত্নের বিনিময়ে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে শুধু অশান্তি আর দুশ্চিন্তাই তাঁর অদৃষ্টে জুটেছে। কিন্তু যে দায়িত্ব নিজে ঘাড় পেতে নিয়েছেন তা সব সময় হাসিমুখে নিখুঁতভাবে পালন করে গেছেন। তাঁর মুখের হাসি কিছুতেই মেলাতে পারে নি; তাঁর মনের শান্তি কিছুতেই নষ্ট হয় নি। জগতে সব রকম ভালবাসার মধ্যে মায়ের ভালবাসাই সব চেয়ে বড়। তবুও মায়ের মনে সন্তানের কাছ থেকে প্রতিদান পাবার একটা ক্ষীণ আশা থাকে। সন্তান একেবারে অসৎ হলে, তার আচরণ মা বেশিদিন স্থিরভাবে সহ্য করতে পারেন না। সারদাদেবীর অন্তরে যে ভালবাসা ছিল সে ভালবাসা গর্ভধারিণী জননীর ভালবাসার চেয়েও গভীর। জগতে সে ভালবাসার তুলনা মেলে না।

অধিকাংশ মানুষের ভালবাসার ক্ষমতা খুব সীমাবদ্ধ। লোকে যখন কোন এক ব্যক্তিকে বিশেষভাবে ভালবাসতে আরম্ভ করে তখন অন্য লোকেদের উপর তাদের ভালবাসা স্বভাবতঃই কমে আসতে থাকে। জাগতিক ভালবাসা সাধারণতঃ আমাদের মনকে খুব সঙ্কীর্ণ, অপর সকলের সুখ-দুঃখের প্রতি উদাসীন করে তোলে। ব্যক্তিবিশেষকে ভালবাসার ফলে মানুষ হয়ে পড়ে লোভী ও হিসাবী—কতটা ভালবাসলে তার বদলে কতটা কি পাওয়া যাবে, এই ভাবনা মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কিন্তু সারদাদেবীর জীবনে যে ত্যাগ, উদারতা ও শিশুর মত সরলতা দেখতে পাই, তার তুলনা মেলা দায়।

তাঁর হৃদয় ছিল সমুদ্রের মত বিশাল ও গভীর। ঘটনাচক্রে যাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সাহায্য করার দায়িত্ব তাঁর উপর এসে পড়েছিল তাদের জন্য অনেক কিছু করলেও শিষ্য ও ভক্তদের উপর তাঁর ছিল অপরিসীম ভালবাসা। যে কেউ তাঁর সম্পর্কে এসেছেন তাঁরই মনে হয়েছে যে, সারদাদেবী তাঁকেই সব চেয়ে ভালবাসেন; তিনি যেন নিজের মায়েরও বাড়া। এ কি বড় সহজ কথা! শুধু তাঁর অল্পবুদ্ধি আত্মীয়স্বজনেরা এবং রাধু ও রাধুর মা ভাবতেন, তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব কেবল তাঁদের জন্য ব্যয় না করে বা জমিয়ে না রেখে কেন অপরের জন্য খরচ করবেন?

বিষয়ের উপর আসক্তি যত বাড়ে বিষয় থেকে মনকে গুটিয়ে নিয়ে নিজের খুশিমত তাকে চালাবার ক্ষমতাও তত কমতে থাকে। এ নিয়ম সংসারী সব মানুষের পক্ষে খাটে, শুধু খাটে না তাঁদের পক্ষে, যাঁরা ভগবানকে একমাত্র সহায় সম্বল বলে জ্ঞান করেছেন। মন তাঁদের সম্পূর্ণ বশ; মনকে তাঁরা খুশিমত কোন বিষয়ে লাগাতে পারেন; আবার দরকার হ'লে মুহূর্তের মধ্যে সে বিষয়ে একেবারে ভুলে ষোল আনা মন অন্য কাজে দিতে পারেন। সারদাদেবীও নিজের মনকে যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারতেন। দু'টা ঘটনা উল্লেখ করলেই কথাটা বেশ বোঝা যাবে।

জয়রামবাটী থেকে পাঁচ মাইল দূরে কোয়ালপাড়া গ্রামে জগদম্বা আশ্রমে তিনি তখন কিছুদিনের জন্য বাস করছেন। তাঁর এক ভাইঝির এক ছোট ছেলে একদিন বিকালে মারা গেল। ছেলেটিকে তিনি খুব ভালবাসতেন। তার চিকিৎসার জন্য যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করেছিলেন। ছেলেটির মৃত্যুসংবাদ পেয়ে, শোক পেলে মেয়েরা সাধারণতঃ যেমনভাবে কান্নাকাটি করে, তিনি সেইরকম কান্না জুড়ে দিলেন। সন্ধ্যা হয়ে এল, ঠাকুরের আরতির সময় হয়েছে। তাঁকে

শোকাতুরা দেখে আশ্রমের আর কারও আরতি করার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। 'আরতির সময় হয়েছে' বলে তিনি নিজেই কিন্তু একটু পরে উঠে পড়লেন। কান্না তাঁর থেমে গেল ; আরতি ও অপর কাজকর্ম প্রতিদিন যেমনভাবে করতেন ঠিক সেইভাবে করলেন—কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হ'ল না। তখন তাঁকে দেখে আর কারও বুঝবার উপায় রইল না যে, একটু আগেই তিনি কেঁদে ভাষাচ্ছিলেন।

যার উপর মানুষের বিশেষ ভালবাসা থাকে, মরণকালে তার কথা বিশেষ করে মনে পড়ে ; তাকেই কাছে রেখে মানুষ মরতে চায়। কিন্তু সারদাদেবীর ক্ষেত্রে দেখি ব্যাপারটা ঘটল উল্টা। দেহত্যাগের কিছু আগে থেকে রাধুর উপর তাঁর সব আকর্ষণ চলে গেল। তিনি বরাবর রাধু ও তাঁর অপর দুই ভাইঝি ও তাদের ছেলেপুলেগুলোকে জয়রামবাটীতে পাঠিয়ে দিতে জেদ করতে লাগলেন। রাধুর ছোট ছেলেটি তাঁর কাছে হামাগুড়ি দিয়ে এলে বিরক্ত হয়ে তাকে সরিয়ে নিতে আদেশ করতেন। বলতেন, "তোদের মায়া একেবারে কাটিয়েছি। যা যা, আর পারবি নে।" ভক্তদের সকলের ভাবনা, রাধু চলে গেলে তিনি কি নিয়ে থাকবেন। কিন্তু তাঁর কথা, "মন তুলে নিয়েছি, মায়া কাটিয়েছি, আর নয়।" স্বামী সারদানন্দজী তাঁকে অনেক করে বুঝিয়ে বললেন, "আপনার এই অসুখের সময় এদের যেতে কষ্ট হবে। আপনি একটু সেরে উঠলে এরা যাবে।" এই অনুরোধের উত্তরে তিনি বললেন, "তা পাঠিয়ে দিলেই ভাল হ'ত। তবে যেন আমার কাছে ওরা আর না আসে।

ষোড়শ অধ্যায়

আরও তীর্থদর্শন

প্রথমবার পুরীধামে যাত্রার পথে সারদাদেবী কোঠারে গিয়ে কিছুকাল বাস করেন, একথা আগেই বলা হয়েছে। সন ১৩১৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে আবার তিনি কোঠারে যান ও সেখানে দু'মাস কাটান। তাঁর এখানে থাকার সময় একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল।

সে সময় কোঠারের পোস্টমাস্টার ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক। ব্রাহ্মণের ছেলে তিনি, ঘটনাচক্রে খৃষ্টানধর্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু পরে নিজের ধর্মত্যাগের জন্য তাঁর মনে খুব অনুতাপ আসে, তিনি হিন্দুধর্মে ফিরে আসার জন্য ব্যাকুল হন। আজকাল শুদ্ধি সংগঠন ইত্যাদি নানারকম আন্দোলন চলেছে—নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে অন্য ধর্মাবলম্বীকে হিন্দুধর্মে আনবার জন্য। এখন আর কোন লোকের পক্ষে অন্য ধর্মগ্রহণের পর হিন্দুধর্মে ফিরে আসা তেমন শক্ত কথা নয়। কিন্তু তখন তো সমাজের অবস্থা এখনকারের মত ছিল না। দেবেনবাবু তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা সারদাদেবীর সঙ্গীদের নিকট প্রকাশ করলে তাঁরা তাঁকে সকল কথা জানান। তাঁর অনুমতি পেয়ে দেবেনবাবু প্রায়শ্চিত্ত করে আবার উপবীত ও গায়ত্রী মন্ত্র গ্রহণ করলেন, সারদাদেবীর সঙ্গী একজন ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে। পৈতা নিয়ে দেবেনবাবু সারদাদেবীকে প্রণাম করলে তিনি দেবেনবাবুকে করজোড়ে নমস্কার করলেন এবং পরদিন তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন।

মাঘমাসের শেষভাগে সারদাদেবী আটজন সঙ্গী ও সঙ্গিনীসহ শ্রীশ্রীরামেশ্বর দর্শনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কোঠার থেকে ভদ্রকে

এসে ট্রেন ধরলেন। পথে চিল্কা হ্রদের শোভা দেখে তিনি বিশেষ আনন্দিত হলেন। ট্রেন মাদ্রাজ স্টেশনে পৌছুলে মাদ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁদের সকলকে বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁরা মাদ্রাজে প্রায় একমাস ছিলেন।

মাদ্রাজে অনেক মহিলা তাঁকে দর্শন করতে আসতেন। স্কুলের ছাত্রীরা আসত দলে দলে, আর তাঁকে ভজন ও বাজনা শোনাত। যারা দর্শন করতে আসতেন তাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন ইংরাজি-শিক্ষিতা—কিন্তু বাংলা ভাষা কেউ জানতেন না। আর তিনি না জানতেন ইংরাজি, না জানতেন তামিল তেলেগু প্রভৃতি কোন দক্ষিণী ভাষা। কাজেই স্বচ্ছন্দে আলাপ আলোচনা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তবুও কি এক অজানা আকর্ষণে মহিলারা তাঁর কাছে আসতেন এবং পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরতেন। মাদ্রাজ অঞ্চলের মেয়েদের সম্পর্কে একদিন তিনি বলেছিলেন, ওখানকার মেয়েরা খুব লেখাপড়া জানে। আমাকে তারা লেক্‌চার দিতে বললে। আমি বললাম, আমি লেকচার দিতে জানি না। যদি গৌরদাসী আসত তবে দিত।" মাদ্রাজে থাকার সময় কয়েকজন পুরুষ ও নারী তাঁর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন। মাদ্রাজে বাসকালে তিনি পুরাতন দুর্গ, জলচর প্রাণিনিবাস, ময়লাপুর পল্লীর শিবমন্দির ও ট্রিপ্লিকেন পল্লীর পার্থসারথির মন্দির দর্শন করেন।

মাদ্রাজে থেকে তাঁরা মাদুরা শহরে গেলেন। এখানকার মীনাক্ষী-দেবীর মন্দিরের ন্যায় বৃহৎ মন্দির ভারতে খুব কম আছে। মাদুরা শহরে একদিন যাপন করে তাঁরা পরদিন রাত্রে রামেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। পুরাণে আছে, শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করে লঙ্কা থেকে ফিরবার পথে এখানে নিজ হাতে বালির শিবলিঙ্গ তৈরী করে পূজা করেন। সমুদ্রতীরে প্রকাণ্ড এক জায়গা জুড়ে অতি বিশাল পাথরের

মন্দির। আর শুধু তো একটা মন্দির নয়, তার সঙ্গে নাটমন্দির, গোপুরম্ আরও কত ঘরবাড়ি। আবার সে সকলের কারুকার্য কতই না চমৎকার! দেখে আশ মেটে না! রামেশ্বর দ্বীপ রামনাদের রাজার জমিদারীর অধীনে। তখনকার রাজা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য। তিনি যে সারদাদেবীর ও তাঁর সঙ্গীগণের পূজা ও দর্শনাদির সব রকম সুব্যবস্থা করে দিলেন, একথা বলা বাহুল্য।

মন্দিরের পূজারীরা দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। উত্তর ভারতের সব শিব-মন্দিরে সকলে ঢুকতে পারে এবং শিবলিঙ্গ স্পর্শ করে পূজা করতে পারে। কিন্তু রামেশ্বরে ব্যবস্থা অন্যরূপ। সেখানে গর্ভমন্দিরে—যেখানে শিবলিঙ্গ স্থাপিত—পূজারী ব্রাহ্মণদের বাড়ীর মেয়েরা ঢুকতে পেলেও, ভারতের অপর প্রদেশের ব্রাহ্মণেরা পর্যন্ত প্রবেশ করতে পায় না; পূজারীদের হাত দিয়েই পূজা দিতে হয়। কিন্তু রামনাদের রাজার বিশেষ আদেশে, মন্দিরের পুরোহিতগণ সারদাদেবী ও তাঁর সঙ্গীগণ যে তিনদিন রামেশ্বরে ছিলেন, সেই তিনদিনই তাঁদের গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করে নিজের হাতে শিবের পূজা করতে দিয়েছিলেন। রামেশ্বর দর্শন সম্বন্ধে সারদাদেবী বলেছেন, "রামনাদের রাজা, আমি এখানে এসেছি শুনে, তাঁর দেওয়ানকে হুকুম দিলেন, মন্দিরের মণিকোঠা (রত্নাগার) খুলে আমাকে দেখাতে; আর যদি আমি কোন জিনিস পছন্দ করি, তখনই যেন তা আমাকে উপহার দেওয়া হয়। আমি আর কি বলব? কিছু ঠিক করতে না পেরে বললাম, 'আমার আর কি প্রয়োজন?' আবার তারা ক্ষুণ্ণ হবে ভেবে বললাম, 'আচ্ছা, রাধুর যদি কিছু দরকার হয়, নেবে এখন।' রাধুকে বললাম, 'দেখ তোর যদি কিছু দরকার হয়, নিতে পারিস। তারপর যখন হীরা-জহরতের জিনিস দেখছি তখন কেবলই আমার বুক দুরদুর করছে। ঠাকুরের কাছে আকুল হয়ে প্রার্থনা করছি, 'ঠাকুর, রাধুর যেন কোন

বাসনা না জাগে।' তা রাধু বললে, 'এ আবার কি নেব? ওসব আমার চাই না। আমার লেখবার পেনসিলটা হারিয়ে ফেলেছি, একটা পেনসিল কিনে দাও।' আমি একথা শুনে হাঁপ ছেড়ে বাইরে এসে রাস্তার দোকান থেকে দু'পয়সার একটা পেনসিল কিনে দিলাম।"

রামেশ্বরে তিন দিন বাসের পর মাদ্রাজ হয়ে সকলে গেলেন বাঙ্গালোরে। সেখানকার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী নির্মলানন্দের আগ্রহে তাঁকে সেখানে যেতে হয়েছিল। সাধারণকে না জানালেও তাঁকে দর্শনের জন্য খুব ভিড় হয়েছিল। সে সম্বন্ধে তিনি একদিন বলেছিলেন, "এখন সব চারদিকে প্রচার হয়ে গিয়েছে কিনা, তাই এত লোক! পথে রেল থেকে নামতে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল; এত উঁচু হয়ে গেল রাস্তা।"

বাঙ্গালোর থেকে আবার মাদ্রাজ হয়ে তিনি কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে গোদাবরী নদীতে স্নানের জন্য রাজমহেন্দ্রী শহরে একদিন বিশ্রাম করেন। সেখান থেকে পুরীতে এসে দিন দুই বাসের পর কলকাতায় ফেরেন।

সারদাদেবী তৃতীয় ও শেষবার কাশীদর্শনে যান ১৩১৯ সালের কার্তিক মাসে। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের নিকটে লক্ষ্মীনিবাস নামে এক বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। এ যাত্রায় তিনি প্রায় আড়াই মাস কাশীবাস করেছিলেন। কাজেই ধীরে সুস্থে সব প্রধান মন্দির ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থানসকল দেখার তাঁর যথেষ্ট সময় হয়েছিল। বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শনের পর তিনি তৃতীয় দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি পালকিতে করে ঘুরে ঘুরে রোগীদের সমস্ত ঘর দেখলেন। সেখানকার ঘরবাড়ি, সেবার ব্যবস্থা প্রভৃতি দেখে খুব খুশি হলেন। কথায় কথায় বললেন, "স্থানটি এত সুন্দর যে, আমার ইচ্ছে হচ্ছে কাশীতে থেকে যাই।"

পরে একদিন তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালিত বিধবাদের আশ্রম দেখতে যান। বিধবারা তাঁকে প্রণাম করতে গেলে সেই আশ্রমের পরিচালিকার সঙ্গে তাঁর এই রকম বথাবার্তা হয়।

"এ কিগো? এরা সব কাশীবাসী, এরা আবার প্রণাম করবে কেন?"

"তা করবে না, মা? আপনার অন্নে এরা প্রতিপালিত।"

"বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণাই আছেন, মা। তুমি বুঝি এদের দেখাশুনা কর?"

"হাঁ, মা যেমন করান।"

"আহা, তা বেশ। এই অনাথা বুড়ীদের সেবা করলে, নারায়ণের সেবা করা হয়।"

কাশীতে অনেকে তাঁর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসে বলত, 'আপনার ছেলেদের বলে দিন আমাকে কিছু সাহায্য করতে।' এই প্রসঙ্গে একদিন তিনি বলেছিলেন, "আমি আর কি বলব বল? তারা যেমন বুঝবে তেমনি করবে তো?....ওরাই বা কি করবে বল? এই দেখ না, অনাথা বুড়ীদের অন্য আশ্রম করেছে, তাদের কত সেব-যত্ন; রোগীদের জন্য হাসপাতাল; আবার বাইরে যে কত লোককে সাহায্য করে তার ঠিক আছে কি? ছেলেগুলি কি খাটুনিই খাটে! সবই তাঁর ইচ্ছা, মা। কোথা থেকে কি করাচ্ছেন তিনিই জানেন।"

একদিন দুপুরবেলা সারদাদেবী একটু ঘুমিয়ে পড়েছেন। এমন সময় একটা গানের আওয়াজ শোনা গেল। কেউ মিহি গলায় অতি করুণ স্বরে গাইছে—

আমার মা কোথায় গেলে?
অনেকদিন দেখি নাই, মা, নে আমায় কোলে।
তুই গো কেমন জননী, সন্তানে হও এত পাষাণী,
দেখা দে মা, আর কাঁদাস নে, তনয়া বলে॥

সারদাদেবী হঠাৎ উঠে পড়লেন এবং সঙ্গিনীকে নিয়ে ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দেখলেন একটি মেয়ে এই গান গাইছে, আর চোখের জলে তার বুক ভেসে যাচ্ছে। তিনি সেখানে বসতেই সে তাঁকে প্রণাম করে বলল, 'মা, আমার অনেক দিনের আশা পূর্ণ হল। আজ আমার কি আনন্দ হচ্ছে, বলতে পারি না, মা।' তিনি তাকে আশীর্বাদ করে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমি আপনার ভিখারিণী মেয়ে, মা।"

"কোথায় থাক ?"

"অন্নপূর্ণার দরজায়, নয় দশাশ্বমেধ ঘাটে বেহারীবাবার মন্দিরের কাছে বসে থাকি।"

"ভিক্ষাতে তোমার বেশ চলে তো ?"

"আপনার আশীর্বাদে বেশ চলে যায়। এসবের জন্য কোন ভাবনা নেই।....কিসে একটু ভক্তি হয় তাই ভাবি, মা।"

"তা হবে বই কি, মা ; তুমি এমন স্থানে রয়েছ।...."

সারদাদেবী তাঁকে আর একটা গান গাইতে বললেন। সে গাইল—

মা আমারে দয়া করে
শিশুর মত করে রাখ ;
শৈশবের সৌন্দর্য ছেড়ে
বড় হতে দিও নাকো।
সুন্দর সরল প্রাণ
মান অপমান নাহি জ্ঞান,
হিংসা নিন্দা লজ্জা ঘৃণা
কিছুই সে জানে নাকো।

গান শুনে তিনি বললেন, "আহা, কি চমৎকার গানটি !"

মেয়েটি—"অনেক দিন ধরে আপনাকে দেখবার বড় সাধ ছিল। আপনি এখানে আছেন শুনে আসব ভাবি, কিন্তু ভয় করে, পাছে কেউ কিছু বলে।"

"কেউ কিছু বলবে না। তোমার যখন ইচ্ছা এস।"

সারদাদেবী কাশীতে গেলেই বিশিষ্ট সাধুদের দেখতে যেতেন এবং তাঁদের সকলকে উচিতমত সম্মান দেখাতেন। শেষবারে চামেলী পুরীকে দর্শন করেন—ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু তোতাপুরীর সময়কার লোক। তাঁকে সারদাদেবীর সঙ্গিনী গোলাপ-মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কে খেতে দেয়?" উত্তরে বৃদ্ধ সাধু খুব তেজ ও বিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "এক দুর্গামাঈ দেতী হ্যায়, ঔর কোন্ দেতা?" উত্তর শুনে সারদাদেবী খুব খুশি হয়েছিলেন এবং পরদিন তাঁর জন্য কমলালেবু, সন্দেশ ও একখানা কম্বল পাঠিয়েছিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

মা ও গুরু

সংসারে স্ত্রীলোকদের অপর স্ত্রী বা পুরুষদের সঙ্গে যত রকমের সম্পর্ক দেখা যায়, সে সকলের মধ্যে কন্যা, ভগিনী, স্ত্রী ও জননী এই চারিটা সম্পর্কই প্রধান। সারদাদেবীর জীবনে দেখি এই চারি ভাবই অতি অপরূপভাবে বিকশিত হয়েছে। তাই মনে হয়, এ যুগে মেয়েদের আদর্শ কেমন হওয়া উচিত তাই দেখাবার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন।

তিনি যে কেমন কন্যা ছিলেন, সে পরিচয় আমরা পেয়েছি। গরীবের সংসারে জন্মগ্রহণ করে ছোটবেলা থেকে যতদিন বাবার সংসারে বাস করেছেন ততদিন সাধ্যমত বাপ-মায়ের সেবা করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর যখন ভাইদের সংসারে বাস করতে গিয়েছেন, তখন মায়ের পরিশ্রম লাঘবের জন্য নিজে যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছেন। পরবর্তী কালে যখন হাজার হাজার লোক তাঁকে 'মা' বলে ডেকেছে, তাঁর স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হয়েছে, তখনও তিনি বৃদ্ধা শ্যামাসুন্দরীকে পরম যত্নে সেবা করেছেন।

জয়রামবাটীতে ভাইদের সংসারে বাসের সময় তাঁর যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তাতে মনে হয় বিশেষ সৌভাগ্য থাকলে তবে এ রকম দিদি পাওয়া যায়। ভাইদের নিকট তাঁর আশা করবার কিছু ছিল না—তাঁদের উপর নির্ভর করার তাঁর কোন প্রয়োজন ছিল না। অন্যপক্ষে, তাঁদের সংসারে বাস করে তাঁকে অনেক কষ্ট করতে, অশেষ ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়েছে। কিন্তু সে সকল তিনি হাসিমুখে সহ্য করেছেন। আর শুধু জয়রামবাটীতে থাকার সময় নয়, যখন কলকাতায় এসে বাস করেছেন, তখনই সুরবালা ও রাধু, নলিনী, মাকু প্রভৃতি ভাই ঝিরা তাঁর সঙ্গে এসেছে। এই ভাইঝিগুলিকে তিনি পরম যত্নে মানুষ করেছেন, তাদের বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন; এমন কি, ভাইঝি-জামাইগুলিকেও নানা কারণে অনেক দিনের জন্য তাঁর সংসারে স্থান দিতে হয়েছে। অসংসারী হলেও মস্ত এক সংসারের ঝামেলা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। আবার এই ভাইঝিগুলির একটিও তাঁর মনের মত ছিল না। তবু তিনি তাদের সকল আবদার পূরণ, সকল অত্যাচার ক্ষমা করে তাদের কল্যাণের জন্য সর্বদা চেষ্টা করেছেন। সাধারণ সংসারী মানুষের মত তাঁর এই সব ব্যবহার দেখে ভক্তদের কেহ কেহ অন্তরে সংশয় পোষণ, কখনও বা মুখে তা প্রকাশ করে বলেছেন, "মা, তুমি তো দেখছি ঘোর মায়ায় বদ্ধ।" তিনি অতি সরলভাবে উত্তর দিয়েছেন। "কি জান বাবা, আমরা মেয়েমানুষ; আমাদের সব এই রকম।"

তিনি যে কেমন স্ত্রী ছিলেন সে কথা অনেক বলা হয়েছে। আমাদের দেশের আদর্শ হচ্ছে, স্ত্রী সর্বপ্রকারে স্বামীর অনুগামিনী হবেন—স্বামীর কল্যাণসাধনকে সর্বদা নিজের ব্রতরূপে গ্রহণ করবেন। এই আদর্শ থেকে বিচার করলে তাঁর ন্যায় স্ত্রীর জুড়ি পুরাণ ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি মেলা ভার। শুধু স্বামীর সেবা নয়, যখন দক্ষিণেশ্বরে বাস করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের বৃদ্ধা জননী চন্দ্রমণিকেও তিনি পরম ভক্তির সঙ্গে সেবা করেছেন।

ভারতবর্ষে, বিশেষভাবে হিন্দুর সংসারে মায়ের স্থান সকলের উপরে। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র আমরা—ভারতবাসীরা ঈশ্বরকে মাতৃরূপে চিন্তা ও উপাসনা করে থাকি। 'মা' এই নামের মধ্যে যে মাধুর্য, যে আশা, যে শক্তি, যে নির্ভরতার সন্ধান আমরা পাই তেমন আর কোন নামে পাই না। কন্যার ভক্তি, ভগিনীর স্নেহ, পতির সেবা ও প্রীতি—এ সবই মায়ের মধ্যে পাই ; আর তারও বেশি পাই অহেতুক অপরিসীম স্নেহ—নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে সর্বদা সন্তানের কল্যাণ-কামনা। শ্রীসারদাদেবীর জীবনে দেখি এই মাতৃভাবের এমন এক অপরিসীম প্রকাশ, যার তুলনা আর কোথাও মেলে না। একটি সন্তানেরও জননী না হয়ে, তিনি যে কেমন করে নিজের জীবনে মাতৃত্বের সকল গুণের অসাধারণ প্রকাশ দেখিয়ে চিরকালের জন্য জগতে নারীজীবনের আদর্শ রেখে গেলেন, সেকথা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। তিনি একবার নিজমুখে এক শিষ্যকে বলেছিলেন, "বাবা, জান তো, ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে রেখে গেছেন।" তাঁর জীবন আমরা যতই আলোচনা করব ততই এ কথার সত্যতা বুঝতে পারব।

শ্রীরামকৃষ্ণের শাশুড়ী শ্যামাসুন্দরী একদিন তাঁকে শুনিয়ে

বলেছিলেন, "আমার সারদার কি এক পাগল জামাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হল। একটাও ছেলেপুলে হল না, পরে ওর কি হবে ?" এ কথা শুনে তিনি বললেন, শাশুড়ীঠাকরুণ, ওর ছেলের জন্য ভাববেন না, পরে ওর এত ছেলে আসবে যে 'মা' ডাক সামলাতে পারবে না।" তাঁর এই ভবিষ্যৎবাণী সফল হতে বেশি সময় লাগে নি। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যরা তো সারদাদেবীকে 'মা' বলে ডাকতেন ও মায়ের মত শ্রদ্ধাভক্তি করতেন ; পরে যখন থেকে তিনি কলকাতায় এসে বাস করতে শুরু করলেন তখন থেকে ধর্মপিপাসু নরনারীরা একে একে তাঁর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগল। বিশেষভাবে আমেরিকায় ধর্মপ্রচার করে স্বামী বিবেকানন্দ যখন ভারতে ফিরলেন এবং সারাদেশে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম বিশেষভাবে প্রচারিত হল এবং তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যগণ সারদাদেবীর কলকাতায় এসে থাকার সুব্যবস্থা করতে পারলেন, তখন থেকে তাঁর শিষ্য-শিষ্যার সংখ্যা বিশেষভাবে বাড়তে লাগল।

আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে জয়রামবাটীতে তাঁর দিন যেভাবে কাটত তার কিছু পরিচয় আমরা পেয়েছি। সেটা তাঁর জীবনের একটা দিক মাত্র। যতদিন তাঁর ভক্তসংখ্যা বিশেষ বাড়েনি এবং স্বামী সারদানন্দের চেষ্টায় জয়রামবাটীতে তাঁর বাসের জন্যে পৃথক বাড়ি তৈরি হয় নি, ততদিন তাঁর অধিকাংশ সময় ঐভাবে কেটেছে ; তারপর একে একে ভক্তগণের জয়রামবাটী যাত্রা শুরু হওয়ার সঙ্গে তাঁর জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হল।

তিনি কলকাতা বা জয়রামবাটী যেখানেই থাকতেন, সেখানেই ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল বা সংসারের নানা দুঃখে তাপিত শত শত নরনারী যেতে শুরু করলেন তাঁর চরণে আশ্রয়লাভের জন্য। আর শুধু যে বাঙ্গালী বা হিন্দু এসেছেন তা নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত

থেকে নানা ভাষায় ও নানা ধর্মের কত নরনারী তাঁর কৃপা পেয়ে ধন্য হয়েছেন। কোন কোন ভাগ্যবান ভাগ্যবতীর জীবনে এমন সব অলৌকিক ব্যাপার ঘটেছে যে, তাঁরা বহু দূর দেশ থেকে শত বাধা অতিক্রম করে ছুটে এসেছেন তাঁর অনুগ্রহলাভে জীবনকে সার্থক করতে। আবার এমন বহু লোকও এসেছেন, যাঁদের স্বভাব সৎ ছিল না, শুধু অপরের কাছে তাঁর মহিমার কথা শুনে এসেছেন। তবু কদাচিৎ কোন লোককে দীক্ষা না দিয়ে তিনি ফিরিয়েছিলেন।

দীক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁর নিজের কোন আগ্রহ ছিল না, কিন্তু লোকে এসে কেঁদে পড়লে তিনি মন্ত্র না দিয়ে পারতেন না। যতদিন তাঁর শরীর সুস্থ ছিল ততদিন বেলুড় মঠে যে সকল যুবক সাধু হবার জন্য এবং যে সব গৃহস্থ মন্ত্রদীক্ষার জন্য যেতেন তাঁদের অধিকাংশকেই তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হত। মন্ত্রদীক্ষা ছাড়া অনেক যুবককে তিনি ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাসের দীক্ষাও দিয়েছেন। এই দুই দীক্ষার আসল ভাবটুকু তিনি শিষ্যের অন্তরে দিয়ে দিতেন, এবং আনুষ্ঠানিক ব্যাপারগুলা বেলুড় মঠে গিয়ে অনুষ্ঠান করতে বলতেন।

তিনি ছিলেন অসাধারণ গুরু; যাকে কৃপা করতেন তার পাপের ভার নিজে গ্রহণ করতেন। তাঁর শরীরের নানা রোগ যে শিষ্যগণের পাপ গ্রহণের ফলে হয়েছিল এ কথা তিনি আন্তরিক বিশ্বাস করতেন। আর এ ব্যাপার বহু লোকে প্রত্যক্ষ করেছে যে, অসৎ লোকে প্রণাম করার ফলে তিনি পায়ে দারুণ জ্বালা অনুভব করেছেন; বার বার পা ধুয়ে তবে সে জ্বালার নিবৃত্তি হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি নিজমুখে এক শিষ্যকে বলেছেন, "দয়ায় মন্ত্র দিই। ছাড়ে না, কাঁদে; দেখে দয়া হয়। নতুবা আমার কি লাভ? মন্ত্র দিলে তার পাপ গ্রহণ করতে হয়। ভাবি, শরীরটা তো যাবেই, তবু এদের হোক।" 'মন্ত্রের মধ্য দিয়ে শক্তি যায়। গুরুর শক্তি শিষ্যে যায়, শিষ্যের গুরুতে আসে।

তাই মন্ত্র দিলে পাপ নিয়ে শরীরে এত ব্যাধি হয়। গুরু হওয়া বড় কঠিন—শিষ্যের পাপ নিতে হয়। শিষ্য পাপ করলে গুরুরও লাগে। ভাল শিষ্য হলে গুরুরও উপকার হয়। কারও বা হঠাৎ উন্নতি হয়, কারও বা ক্রমে হয়। যার যেমন সংস্কার।'

এই দীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে তার লাভের কিছুই ছিল না, টাকা-পয়সা বা মান-যশ কিছুরই কাঙাল তিনি ছিলেন না। গৃহস্থেরা দীক্ষা নিতে এলে অনেককে তিনি বলতেন কুলগুরুর কাছে যেতে। যাঁরা তাঁকে ছাড়তেন না, তাঁদের কাউকে কাউকে তিনি অঙ্গীকার করিয়ে নিতেন যে, তাঁরা কুলগুরুর বার্ষিক বৃত্তি বন্ধ করবেন না বা বাড়িয়ে দেবেন। কত ধনী মানী বিদ্বান ব্যক্তি তাঁর কৃপা পেয়েছেন, কিন্তু তিনি যে কারও গুরু এ অভিমান তাঁর মনে ক্ষণেকের জন্যও স্থান পেত না। দীক্ষার শেষে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি দেখিয়ে সকলকে বলতেন,—'ইনিই তোমার গুরু।' শিষ্যদের কাছে তিনি কখনও টাকা-পয়সার প্রত্যাশা করতেন না। কারও কাছে কিছু চাওয়া তাঁর স্বভাবের বিরোধী ছিল। শিষ্যেরা খুশিমত যখন যা দিতেন তাতেই তাঁর সংসারের ও উপস্থিত ভক্তগণের খরচ চলে যেত।

দীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে তিনি প্রচলিত নানারকম খুঁটিনাটি নিয়ম মেনে চলতেন না; যখন যেভাবে যাকে দীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করতেন, তখন তাকে সেইভাবে দিয়েছেন। দু'একটা ঘটনার উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে যে এই দীক্ষাদানের ব্যাপারে শিষ্যের কল্যাণ ছাড়া আর কোন চিন্তা তাঁর মনে স্থান পেত না।

তিনি তখন কোয়ালপাড়ায়—জয়রামবাটীর নিকটবর্তী এক গ্রামে—কিছুদিনের জন্য বাস করছিলেন। এই সময় রাজনৈতিক কারণে নজরবন্দী এক যুবক ছাড়া পাওয়ার পর তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে দীক্ষা চায়। কোয়ালপাড়া আশ্রমের উপর সে সময় পুলিশের কড়া

নজর। তাই আশ্রমের অধ্যক্ষ যুবকটিকে আশ্রমে রাখতে নারাজ হন। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। এই খবর সারদাদেবীর নিকট পৌঁছিলে তিনি এক শিষ্যকে বললেন, "আহা, ছেলেটি কত কষ্ট পেয়ে ব্যাকুল হয়ে এসেছে। তুমি যদি আজ রাত্রিটা গ্রামের কোন লোকের বাড়িতে তাকে রাখার ব্যবস্থা করতে পার, তবে কাল সকালে আমি ওকে দীক্ষা নিয়ে চলে যেতে বলব।" তাঁর ইঙ্গিত অনুযায়ী যুবকটিকে এক বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা হল। পরদিন সকালে জগদম্বা আশ্রম থেকে একটা মাঠ পার হয়ে রাধুর বাসায় যাবার সময় তিনি যুবকটিকে আসতে দেখলেন। তখন তিনি সঙ্গী এক শিষ্যকে দীক্ষার পূর্বে আচমনের জন্য নিকটবর্তী পুকুর থেকে এক গ্লাস জল আনতে বললেন, আর কাছ থেকে দু'গাছি খড আনিয়ে একটিতে নিজের আসন করলেন, অন্যটিতে যুবককে বসতে বলে তাকে দীক্ষা দিয়ে দিলেন। যুবক কৃতার্থ হয়ে চলে গেল।

সারদাদেবী তখন কলকাতায়। একদিন বারো বছরের একটি ছেলে তাঁকে প্রণামের পর কাঁদতে থাকে। তাকে কাঁদতে দেখে উপস্থিত একজন সাধু কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দিল, "মায়ের কৃপা চাই।" সাধুটি মনে করলেন, ঐটুকু ছেলে, দীক্ষার কি বোঝে? অপরের কাছে শোনা কথা আওড়াচ্ছে। ধমক দিয়ে তিনি ছেলেটিকে বললেন, "কৃপা কিরে? যা, পরে হবে।" ছেলেটি পরের দিন সকালে আবার এসে উদ্বোধনের বাড়ির বাইরের রোয়াকে বসে থাকে— সেদিকে নজর দেওয়ার কারও দরকার হয় না। কিন্তু ছেলেটির উপর যাঁর নজর পড়বার তাঁর ঠিক পড়ল। সারদাদেবী রাধুকে দিয়ে ছেলেটিকে নিজের কাছে ডাকিয়ে দীক্ষা দিলেন। কৃতার্থ হয়ে হাসিমুখে নিচে এসে ছেলেটি উক্ত সাধুকে দেখতে পেয়ে নিজের সৌভাগ্যের কথা জানিয়ে গেল। সাধুটি সারদাদেবীর কাছে এসে বললেন,

"মা ঐটুকু ছেলেকে দীক্ষা দিলে? ও দীক্ষার কি বোঝে?" করুণারূপিণী দেবী উত্তর দিলেন, "তা যা হোক, বাপু; ছেলেমানুষ—কাল তো অমন করে পায়ে পড়ে কাঁদলে! কে ভগবানের জন্য কাঁদছে বল দেখি? এ মতি ক'জনের হয়?"

জয়রামবাটীতে ম্যালেরিয়ায় ভুগে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে তিনি কলকাতায় এসেছেন। শরীর অতি দুর্বল হয়ে পড়েছে—তাঁর সঙ্গে কাউকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। এই সময় বোম্বাই থেকে এক পার্শী যুবক তাঁকে দর্শনের জন্য এসে উপস্থিত। একে ভিন্ন ধর্মের লোক, তায় কত কষ্ট করে অত দূর থেকে এসেছে, এই সব ভেবে স্বামী সারদানন্দজী যুবকটিকে দর্শনের অনুমতি দিলেন। যুবকটি সারদাদেবীকে প্রণাম করে প্রার্থনা জানাল, "মাঈজি, কুছ্ মূলমন্ত্র দীজিয়ে, জিস্‌সে খোদা পহচান যায়—মা, এমন কিছু মূলমন্ত্র দিন যা দিয়ে ভগবানকে জানা যায়।" এই প্রার্থনা শুনে তিনি সেবককে বললেন, "দেবো? দিই দিয়ে।" কিন্তু তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কথা ভেবে সেবক মৃদু আপত্তি জানালো, এবং তাঁর আদেশমতো স্বামী সারদানন্দজীর মত জানতে গেল। কিন্তু মত জেনে ফিরে সেবক দেখলেন, তিনি আসন পেতে নিজে বসে ও যুবকটিকে বসিয়ে দীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত। দীক্ষা নিয়ে যুবকটি চলে গেলে তিনি সেবকটিকে বললেন, "বেশ ছেলেটি, যা বললাম বুঝে নিলে।" দীক্ষা দানের সময় এই সব ভিন্ন ভাষাভাষীদের সঙ্গে তিনি বাংলাতেই কথা বলতেন—কিন্তু তাঁরা ঠিক বুঝে নিতেন।

তাঁর অহেতুক করুণার আর একটা দৃষ্টান্ত—একদিন ট্রেন ধরবার জন্য বিষ্ণুপুর স্টেশনে বসে আছেন, এমন সময় এক রেলের কুলি কোথা থেকে ছুটে এসে হাউমাউ করে কেঁদে তাঁর পায়ে পড়ল। সে হিন্দীতে এই রকমের কথা বলে তার প্রাণের আবেগ প্রকাশ করলে—"তুই

আমার জানকী, তোকে আমি কতদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এতদিন তুই কোথায় ছিলি, মা।" ইত্যাদি। তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে একটা ফুল যোগাড করে আনতে বললেন এবং সেখানেই তাকে দীক্ষা দিলেন। অতি সাধারণ বেশ পরা ঘোমটা ঢাকা পাড়াগাঁয়ের মেয়ের মধ্যে কুলি কি দেখেছিল সেই জানে। দীক্ষাব পর কুলিটিকে বিষ্ণুপুর স্টেশনে আব দেখা যায় নি।

এই ঘটনা থেকে বুঝতে পারি, কেউ তাঁকে প্রশংসা বা সম্মান করবে বা টাকাপয়সা দিয়ে খাতির করবে এসব চিন্তা তার মনে আদৌ স্থান পেত না। কিসে অপরে সুখী হবে, শান্তিলাভ কববে, কেবল এই চিন্তাই তাঁর মনকে সর্বদা অধিকাব করে থাকত, সকলেব কল্যাণ হোক এই আগ্রহ নিযে তিনি সব কাজ কবে যেতেন।

গুরু ও শিষ্যেব মাঝে সব সময় একটা মস্ত বড় ব্যবধান আমরা সর্বত্র দেখতে অভ্যস্ত। শিষ্য গুরুকে সর্বদা সমীহ কবে চলছেন, সব রকমে তাঁর সেবা কবছেন, আর গুরু নিজেব মহিমায় অধিষ্ঠিত থেকে শিষ্যের কল্যাণ কামনা কবছেন—এইটাই আমবা সচবাচর দেখি। কিন্তু সাবদাদেবীকে দেখি এক আশ্চর্য রকমেব গুরু। প্রথম পরিচয় থেকেই শিষ্য-শিষ্যরা তাঁর কাছ থেকে মায়েব স্নেহযত্ন পেতেন এবং তাঁকে গর্ভধারিণী মায়ের মতো একান্ত আপনার ভাবতে অভ্যস্ত হতেন। নিজের অসাধারণ জ্ঞান ও অধ্যাত্মিক শক্তি তিনি মাতৃস্নেহের আবরণে ঢেকে রাখতেন। শিষ্যাদিগকে নিজের পাশে বসাচ্ছেন—নিজের বিছানায় শোয়াচ্ছেন—শিষ্যা দ্বিধা প্রকাশ করলে বলেছেন, "এতে কোন দোষ নাই। কোন শিষ্যা পরিশ্রান্ত হয়ে উপস্থিত হলে নিজের হাতেই পাখা নিয়ে বাতাস করছেন—শিষ্যার আপত্তি শুনছেন না। খাওয়ার পর আঁচাবার সময় হয়ত কোন শিষ্যাকে নিজেই চৌবাচ্চা থেকে ঘটিতে করে আঁচাবার জল তুলে

দিচ্ছেন। কোন শিষ্যার শিশুসন্তান হয়ত বিছানায় প্রস্রাব করেছে—সেটা তিনি নিজেই ধুয়ে শুখাতে দিচ্ছেন।

শিষ্যদিগকেও তিনি ঠিক পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। ভাল রাস্তা ও যানবাহনের অভাবে তখনকার দিনে জয়রামবাটী যাওয়া অতি কষ্টকর ছিল। তাই দূরদেশ থেকে যাঁরা দর্শনলাভের জন্য জয়রামবাটীতে যেতেন তাঁদের অনেকে দিনরাতের যে কোন সময়ে উপস্থিত হতেন। কিন্তু এতে তাঁর কোন ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ হ'ত না।

জয়রামবাটীতে এক তরুণ শিষ্যের হাতে খুব পাঁচড়া হয়েছে। তিনি নিজেই তার ঘা পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছেন এবং খাবার সময় নিজের হাতে খাইয়ে দিচ্ছেন। কোন শিষ্য হয়ত কাজে কোথাও বেরিয়েছে—ফিরতে অনেক বেলা হয়ে গেছে। তিনি না খেয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছেন। শিষ্য অনুযোগ করলে বলছেন—"বাবা, তোমার খাওয়া হয় নি—আমি কি করে খাই?" জয়রামবাটী থেকে যখন কেউ ঘরে ফিরে যাচ্ছেন তখন পথে খাওয়ার জন্য তিনি শিষ্যটির সঙ্গে খাবার বেঁধে দিচ্ছেন ও তাকে পথে এগিয়ে দিচ্ছেন, শিষ্য যতক্ষণ না দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাচ্ছে ততক্ষণ তিনি পথের পানে তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁর ক্বচিৎ কামারপুকুরে বাসের সময় যখন কোন ভক্ত সেখানে গিয়েছেন তখন তিনি তাঁকে আহারের পর উচ্ছিষ্ট পরিষ্কারের আদেশ দিয়েছেন—বলেছেন, "এ গুরুস্থান, এখানে খেয়ে এঁটো পরিষ্কার করতে হয়।" কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কিনা! কিন্তু জয়রামবাটীতে তিনি কাউকে উচ্ছিষ্ট পাতা থালা প্রভৃতি ওঠাতে বা পরিষ্কার করতে দিতেন না। লোক না থাকলে নিজেই সে কাজটা করতেন—আর লোক প্রায়ই থাকত না।

এসব থেকে বুঝতে পারি, 'আমি গুরু' এ অভিমান তাঁর আদপে ছিল না, 'আমি সকলের মা' এই ভাব নিয়েই তিনি শিষ্য-শিষ্যাদের

সঙ্গে সব ব্যবহার করতেন। আর তাঁর এই স্নেহযত্নের মধ্যে ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ ভেদে কোন পার্থক্য কেউ দেখতে পেত না—রাজা বা ভিখারী তাঁর স্নেহ ও করুণালাভে সমান তুষ্ট হতেন—প্রত্যেকেই মনে করতেন, তিনিই তাঁকে সকলের চেয়ে ভালবাসেন।

শিষ্যদের সঙ্গে ব্যবহারে তাঁর জাতির অভিমানেরও কোন পরিচয় পাওয়া যেত না। নিজে খেতে খেতে হয়ত অব্রাহ্মণ শিষ্য-শিষ্যার হাতে প্রসাদ তুলে দিয়ে হাত না ধুয়েই খেতে আরম্ভ করলেন। এতে কেউ আপত্তি প্রকাশ করলে বলতেন, কেন, ওকি আমার ছেলে নয়? কোন নীচজাতীয় ভক্ত হয়ত অপর সকলের সঙ্গে মেলামেশায় সঙ্কোচ বোধ করছেন—তিনি তাতে ক্ষুণ্ণ হয়ে তাঁকে নিজের মনের দৈন্য ঝেড়ে ফেলতে বলছেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

চরিত্র

গত কয়েক শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানের আলোচনার ফলে মানুষ জগতের সম্পর্কে যে কত রকমের জ্ঞানলাভ করেছে এবং এই জীবনে সুখভোগের কত যে বিচিত্র উপায় আবিষ্কার করেছে তার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এত জ্ঞান বাড়া সত্ত্বেও সে নিজে যে কি বস্তু এ কথা ভুলতে বসেছে। রক্ত-মাংসে গড়া দেহটাই তার সব কিছু, এই শরীরের সব রকম ভোগ জোটাতে পারলেই হবে জীবনের চরম সার্থকতা—এই বুদ্ধি নিয়ে সে সমাজে পরস্পরের সম্পর্ক কেমন হবে, তা স্থির করছে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ও তার সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ কিরূপ হওয়া উচিত—এ সকল বিষয়ে অনেক বিচার করে প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্যক্তিরা সমাজের কল্যাণের জন্য যে সকল নীতি

প্রচার করে গিয়েছেন সে-সবের মূল্য দিতে একালের একদল মানুষ আর রাজী নয়। কিন্তু তারা বুঝছে না, শুধু ইহকালের সুখকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করলে স্থায়ী সুখ-শান্তি কিছুতে মিলতে পারে না।

আমাদের দেশের ঋষি-মুনিগণ অনুভব করেছিলেন যে, ঈশ্বরই সকল প্রাণীর মাতৃরূপে বিরাজ করছেন। তাই তাঁদের প্রার্থনা :—

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

যে দেবী সকল প্রাণীর মধ্যে মায়ের রূপ ধরে বর্তমান রয়েছেন সেই জগৎ-জননী দেবীকে নমস্কার করি।

স্ত্রীলোকমাত্রকে ভারতবাসী চিরকাল মায়ের মত দেখে এসেছে। এই আদর্শকে অবলম্বন করে আমরা জ্ঞানে ও গুণে বড় হয়েছিলাম। এই ভাবটা ভুলে যে সময় আমরা সর্বনাশের পথে পা বাড়াচ্ছিলাম, সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসে শেখালেন সকল নারীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করতে—আর সেই মাতৃভাবের আদর্শরূপে গড়ে তুললেন সারদাদেবীর জীবন; দীর্ঘকালের জন্য তাঁকে রেখে গেলেন এই মাতৃভাব জগতে প্রচারের জন্য।

যে মাতৃভাব সারদাদেবীর জীবনে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার কিছু আলোচনা আমরা করেছি। কিন্তু শুধু মাতৃভাব নয়, মেয়েদের জীবনে শোভা পায় এমন সকল সদ্‌গুণেরই বিকাশ তাঁর জীবনে হয়েছিল। সে-সকল আলোচনা করলে মনে হবে, এমন সুন্দর জীবন ইতিহাস পুরাণে তো খুঁজে পাই না। এই সব গুণ নিয়ে তিনি হয়েছেন এযুগের মেয়েদের আদর্শ। তাঁর জীবন, তাঁর শিক্ষা আলোচনা করে—সেই মতো নিজেদের চরিত্রগঠন করে একালের মেয়েরা নিজেরা বড় হবে এবং দেশ ও জাতিকে উন্নত করবে।

তিনি এমনি তো ছিলেন পাড়াগাঁয়ে বৌএর মতো অতিশয় লজ্জাশীলা—সর্বদা ঘোমটা দিয়া থাকতেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সকল শিষ্যের সঙ্গেও কথা বলতেন না। কিন্তু প্রয়োজন হ'লে আবার তাঁর মধ্যে অসাধারণ শক্তির প্রকাশ দেখা যেতো। তাঁর জীবনে নম্রতা ও তেজ—এই দুই গুণের সমানভাবে বিকাশ হয়েছিল। তার দু'একটা দৃষ্টান্ত—

তিনি তখন কামারপুকুরে। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী-শিষ্য হরিশ উন্মাদ অবস্থায় এই সময় সেখানে গিয়ে হাজির। তার স্ত্রী তাকে বিষ খাইয়ে পাগল করে দিয়েছিল। পাগলের মর্জি বোঝা দায়। একদিন সারদাদেবী পাড়া থেকে ফিরে নিজের বাড়িতে ঢুকছেন এমন সময় হরিশ তাঁকে ধরবার জন্য ছুটলো। তখন বাড়িতে আর কোন পুরুষ মানুষ ছিল না। তিনি আর কি করেন, বাড়ির মধ্যে উঠানে যে ধানের গোলা ছিল তার চারিদিকে ঘুরতে লাগলেন। কিন্তু হরিশও ছাড়ে না পিছু পিছু ছুটতে লাগলো। তখন তিনি কি করলেন সে কথা তাঁর নিজের মুখে শুনি—"সাতবার ঘুরে আর পারলুম না! তখন নিজ মূর্তি ধরে দাঁড়ালুম। তারপর তার বুকে হাঁটু দিয়ে জিব টেনে ধরে এমন চড় মারতে লাগলুম যে ও হেঁ হেঁ করে হাঁপাতে লাগল। আমার হাতের আঙ্গুল লাল হয়ে গিয়েছিল।" তখন হরিশ একেবারে ঠাণ্ডা। এরপর তিনি কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

একদিন তিনি উদ্বোধন-অফিসের উপরতলায় রাস্তার দিকের বারান্দায় বসে জপ করছেন। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে এমন সময় সামনের মাঠের কুলিবস্তির একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে বেদম মার শুরু করে দিল—কিল চড়, পরে এমন এক লাথি মারলে যে, মেয়েটি কোলের ছেলেসুদ্ধ গড়িয়ে এসে উঠানে পড়ে গেল। তবু লোকটার রাগ কমে না—তার উপর আবার কয়েক ঘা লাথি। সারদাদেবীর জপ বন্ধ হয়ে গেল। তিনি কি এ অত্যাচার আর সহ্য করতে পারেন?

যাঁর গলার স্বরটি কখনো কেহ নিচে থেকে শুনতে পেত না, তিনিই রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে কঠোর শাসনের স্বরে বললেন, "ও মিন্‌ষে, বৌটাকে একেবারে মেরে ফেলবি নাকি, আ মলো যা!" লোকটা একবার তাঁর দিকে তাকিয়েই অতো যে রেগে উন্মাদ হয়েছিল, মাথা নীচু করে মেয়েটিকে তখনই ছেড়ে দিল।

আর একটা ঘটনা। এক স্বদেশী মামলা সম্পর্কে বাঁকুড়া জেলার এক গ্রামের সিন্ধুবালাদেবী নামের দু'জন গর্ভিণী যুবতীকে (দু'জনেরই নাম সিন্ধুবালা ছিল) পুলিসে ধরে বহুদূর হাঁটিয়ে থানায় নিয়ে যায়। সারদাদেবী তখন জয়রামবাটীতে। এই সংবাদ তাঁর কানে পৌঁছুলে তাঁর অগ্নিমূর্তি দেখে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বললেন, "নিরপরাধ স্ত্রীলোকের উপর এত অত্যাচার যদি কোম্পানীর (ইংরাজ সরকারের) আদেশ হয় তো আর বেশি দিন নয়। এমন কোন বেটাছেলে কি সেখানে ছিল না, যে দু'চড় দিয়ে মেয়ে দু'টিকে ছাড়িয়ে আনতে পারত?" পরে মেয়ে দু'টিকে ছেড়ে দেওয়ার সংবাদ পেয়ে অনেকটা শান্ত হয়ে বললেন, "এ খবর যদি না পেতাম তবে আজ আর ঘুমুতে পারতাম না।"

কি মানুষ, কি পশুপক্ষী, সকল প্রাণীর প্রতি তাঁর করুণার অবধি ছিল না। জয়রামবাটীতে একদিন সুরবালা কোন ছেলেকে খেতে দেওয়ার জন্য আসন, পাতা ও জলের গ্লাস দিয়েছেন। ছেলেটি খেতে বসার আগে একটা বিড়াল সে জলে মুখ দেওয়ায় সুরবালা আবার জল এনে দিলেন। পুনরায় বিড়ালে জলে মুখ দেওয়ায় জল বদলে দিতে হ'ল। আবার বিড়াল সে জল খেতে আরম্ভ করল। পাগলী সুরবালা বিড়ালটিকে তাড়া করে বললেন, "পোড়ারমুখো বেড়াল, মেরে ফেলবো!" তখন চৈত্র মাস। সারদাদেবী নিকটেই ছিলেন। বললেন, "না, না, পিপাসার সময় বাধা দিতে নাই। আর ও-জলে

তো মুখ দিয়ে ফেলেছে।" পাগলী চিৎকার করে উঠে বললেন, "যাক যাক, তোমার বেড়ালকে আর অত দয়া দেখাতে হবে না। মানুষকে দয়া কর না।" তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "আমার দয়া যার উপর নেই—সে হতভাগা। আমার দয়া কার উপর নেই তা বুঝি না—প্রাণীটা পর্যন্ত।"

সারদাদেবী তখন জয়রামবাটীতে। একদিন রাতে কয়েকজন ভক্ত এসে উপস্থিত হয়েছেন। সে-সময় খাওয়াদাওয়া শেষ করে সকলে শুয়ে পড়েছেন। যে সেবক সন্ন্যাসী বাইরের ঘরে ছিলেন তিনি আগন্তুক সকলকে চুপি চুপি বললেন, 'কোন শব্দ না করে বিছানা পেতে শুয়ে পড়। গোলমাল করলে মার ঘুম ভেঙ্গে যাবে।' কিন্তু যাঁর শোনবার তিনি জেগেই ছিলেন। সারদাদেবী সেবককে ডেকে' কারা এসেছেন খোঁজ নিলেন এবং রান্নার যোগাড় করতে লাগলেন। সেবকটি তাঁর সাহায্যের জন্য গেলেন এবং যে পাচিকা ব্রাহ্মণী রান্না করে দিতেন তাকে ডাকতে চাইলেন। কিন্তু সারদাদেবী তাঁকে ডাকতে নিষেধ করে বললেন, 'না। গরীব মানুষ সারাদিন খেটে খুটে বাড়িতে গিয়ে শুয়ে পড়েছে, এখন আর তাকে ডেকে কষ্ট দিও না। ক'টাকাই বা মাহিনা দাও যে তাকে এই রাতে আবার খাটাবে? আমি নিজেই রান্না করব, কোন কষ্ট হবে না।' সকলের প্রতি তাঁর ছিল এই রকমের সহানুভূতি।

তিনি বেঁচে থাকতে থাকতে রামকৃষ্ণ মিশনের যে সব সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সকলের কাজে তিনি বিশেষ উৎসাহ দেখাতেন। কোথাও বন্যা দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি দৈব আপদ উপস্থিত হ'লে সে সব নিবারণের জন্য তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন। দামোদর নদের এক বন্যার বর্ণনা শুনে তিনি কোন ভক্তকে অতি করুণস্বরে বললেন, "বাবা, জগতের হিত কর।" একবার ঘাটালে বন্যাপীড়িতদের সেবার কাজ

শেষ করে একজন সাধু তাঁর নিকট উপস্থিত হলে, তিনি বললেন, "তোমাকে দিয়ে ঠাকুর অনেক কাজ করিয়ে নেবেন। এই তো ঘাটালে তোমরা এসেছিলে, কত লোককে দিলে, কত লোকের উপকার হ'ল।"

কথায় কথায় তিনি একদিন বললেন, "দয়া যার শরীরে নেই, সে কি মানুষ? সে তো পশু। আমি কখনো কখনো দয়ায় আত্মহারা হয়ে যাই।" লোককে দেওয়ার প্রসঙ্গে একজনকে বলেছিলেন, "আমার বালকস্বভাব। আমার কি অত আগে পাছে হিসাব আছে! যে চাইলে দিয়ে ফেললুম।"

তাঁর সময়ে পাড়াগাঁয়ে সমাজের শাসন খুব কঠোর ছিল। জাতি ভেদে আচার-ব্যবহারের বিধান না মানলে সামাজিক শাস্তি পেতে হ'ত। কিন্তু অন্তরের অবাধ ভালবাসার জন্য তিনি সামাজিক গণ্ডীগুলার মধ্যে আটকে থাকতে পারতেন না। জয়রামবাটীতে একদিন রাতে কোন ভক্তকে বললেন, "ভক্তের আবার জাত কি! সব ছেলে এক। আমার ইচ্ছে হয় সকলকে একপাত্রে বসিয়ে খাওয়াই। তা এ পোড়াদেশে জাতের বড়াই আবার আছে। যাই হোক, মুড়িতে তো আর দোষ নাই।" পরদিন সকালে প্রকাণ্ড এক থালায় প্রচুর মুড়ি ও জিলিপি সাজিয়ে ভক্তদের সকলকে একসঙ্গে খেতে বললেন। জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে সে সময় তাঁর বাড়িতে অনেক ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

তাঁর প্রীতি ও সমবেদনা শুধু ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না—উচ্চ নীচ জাতি বর্ণ বিচার না করে তিনি সব মানুষকে সমান চোখে দেখতেন। দু'একটা ঘটনার আলোচনা করলে বোঝা যাবে তাঁর হৃদয় কত উদার ছিল। তাঁর ভাইঝি নলিনীর বিষয়ে কথা উঠতে একদিন তিনি বলছেন, "ওর কথা কি বলবো মা! জয়রামবাটীতে

ডোমেরা বিড়ে পাকিয়ে দিয়েছে, ঘরে দিতে এসেছে। আমি বললুম, এখানে রাখ। তা তারা কত সাবধানে রেখে গেল। ও বলে কিনা, 'ঐ ছোঁয়া গেল, ও সব ফেলে দাও।' এই বলে তাদের গালাগাল— 'তোরা ডোম হয়ে কোন্ সাহসে এমন করে রাখতে যাস্?' তারা তো ভয়ে মরে। আমি তখন বলি, তোদের কিছু হবে না, কোন ভয় নাই। আবার তাদের মুড়ি খেতে দিই।"

একদিন জয়রামবাটীতে আমজাদ নামক এক মুসলমানকে তিনি খেতে বলেছিলেন। তাঁর ঐ ভাইঝি লোকটিকে পরিবেশন করছিল। নলিনীর খুব শুচিবাই। সে দূরে দাঁড়িয়ে ভাত-তরকারি লোকটির পাতে যেন ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। তিনি পরিবেশনের রকম দেখে বিরক্ত হয়ে বললেন, "অমন করে দিলে মানুষ খুশি হয়ে খেতে পারে নাকি? তোমাকে আর পরিবেশন করতে হবে না, আমি দিচ্ছি।" এই বলে লোকটিকে পরিতোষপূর্বক খাওয়ালেন এবং সে উঠে যাবার পর নিজে জল ঢেলে এঁটো জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেললেন। তাই দেখে নলিনী আঁতকে উঠে বলল, "ও পিসিমা, করলে কি, তোমার জাত গেল।" তিনি বকে উঠলেন, "চুপ, শরৎ আমার যেমন ছেলে, আমজাদও আমার তেমন ছেলে।"

শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক এবং তাঁর প্রধান সেবক—আর আমজাদ ছিল জেলখাটা ডাকাত। কত বড় মন হলে তবে এ দুজনকে সমান চোখে দেখা যায়—দুজনকে নিজের সন্তানের মত ভালবাসা যায়!

জয়রামবাটীতে এক সাঁওতালী বুড়ী মাথায় একবোঝা জিনিসপত্র নিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছুতে গিয়েছে। বুড়ী বোঝা নামিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "মাঝি-বৌ, অনেকদিন তুমি আর এসোনি কেন?" বুড়ী করুণস্বরে উত্তর দিল, 'আর মা, আজকাল

বড় কষ্টে পড়েছি। পেটের জ্বালায় নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াই। তাই এখানে মোট নিয়ে আসবার দরকার হলে বাবুরা সব সময় আমার দেখা পায় না। কিছুদিন হ'ল আমার জোয়ান রোজগারী ছেলেটা মারা গিয়েছে।" বুড়ীর কথা শুনে তিনি বললেন, 'বল কি মাঝি-বৌ!' বলতে বলতে তাঁর চোখ ভিজে হয়ে উঠল—আর বুড়ী তাঁর সহানুভূতি পেয়ে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল। তিনিও তাঁর কাছে বসে কাঁদতে শুরু করলেন। কিছু পরে কান্নার বেগ থামলে তিনি নারকেল তেল আনিয়ে বুড়ীর মাথায় ঢেলে দিতে লাগলেন। বুড়ীর একমাথা তেল মাখার পর তার আঁচলে মুড়ি ও গুড় দিয়ে বিদায় দেবার সময় তিনি ছলছল চোখে বললেন, "আবার এসো, মাঝি-বৌ।"

জগতের যে ব্যক্তিকে, যে প্রাণীকে, যে বস্তুকে যতটা সম্মান দেওয়ার, আদর-যত্ন করার প্রয়োজন তা তিনি নিজে করতেন এবং অপরকে করতে বলতেন। তাঁর জীবনে অহরহ এর প্রমাণ পাওয়া যেত। কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় একদিন তাঁকে দেখতে এসেছেন। তিনি রাধুকে আদেশ করলেন, কবিরাজ মহাশয়কে প্রণাম করতে। পরে একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বামুনের মেয়েকে কেন বৈদ্যকে প্রণাম করতে বললেন?' তিনি উত্তর দিলেন, "তা করবে না? কত বড় বিজ্ঞ; ওরা ব্রাহ্মণতুল্য। ওঁকে প্রণাম করবে না তো কাকে প্রণাম করবে?"

কাউকে এক বিড়ালের গায়ে ও মাথায় পা দিয়ে আদর করতে দেখে তিনি বললেন, "ওমা, ও কি করছ? মাথা যে গুরুর স্থান; মাথায় কি পা দিতে আছে? নমস্কার কর।"

কলকাতার বাড়িতে একদিন দুপুরে যখন সকলে বিশ্রাম করছেন, সেই সময় এক ভিখারী ভিক্ষা চাইতে এসেছে। নীচের তলায় যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ভিখারীকে বললেন, 'যাঃ অসময়ে এখন বিরক্ত করিস

মা।' তিনি উপর থেকে সেকথা শুনতে পেয়ে বললেন, "দেখেছ? দিলে ভিখারীকে তাড়িয়ে। ঐ যে নিজেদের কাজ ছেড়ে একটু উঠে এসে ভিক্ষা দিতে হবে, এটুকুও আর পারলে না, আলস্য হ'ল। ভিখারীকে এক মুঠা ভিক্ষা দিতে পারলে না। যার যা প্রাপ্য, তা থেকে তাকে বঞ্চিত করা কি উচিত? এই যে তরকারির খোসাটা, এও গরুর প্রাপ্য। ওটিও গরুর মুখের কাছে ধরতে হয়।"

সাধুরা একদিন একটা ফলের চুপড়ি রাস্তায় ফেলে দিতে বললেন। তিনি শুনে বললেন, "দেখেছ? কেমন সুন্দর চুপড়িটা ওরা ফেলে দিতে বললে! ওদের কি? সাধু মানুষ, ওসবে কি মায়া আছে? আমাদের কিন্তু সামান্য জিনিসটিও অপচয় করা সয় না। ওটি থাকলে তরকারির খোসাটাও রাখা যেত।" এই বলে চুপড়িটা আনিয়ে ধুয়ে রেখে দিলেন।

একজন উঠান ঝাঁট দিয়ে ঝাঁটাটা একদিকে ছুঁড়ে ফেলে রাখলেন। তিনি দেখে বললেন, "ও কি গো, কাজটি হয়ে গেল, আর অমনি ওটি অশ্রদ্ধা করে ছুঁড়ে দিলে? ছুঁড়ে রাখতেও যতক্ষণ, আস্তে ধীরে রাখতেও ততক্ষণ। ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছ বোধ করতে আছে? যাকে রাখ, সেই রাখে। আবার তো ওটি দরকার হবে। তা ছাড়া এ সংসারের ওটিও তো একটা অঙ্গ। সেদিক দিয়েও তো ওর একটা সম্মান আছে। যার যা সম্মান তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।"

দেশবিদেশের কত ধনী গুণী ব্যক্তি তাঁকে দেবীজ্ঞানে ভক্তি করেছে, কিন্তু তাতে তাঁর মনে একটুও বিকার দেখা যেতো না। তাঁর স্বভাবে অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না। এতো সম্মান হজম করা কি সোজা কথা? টাকার মালিক হবার মতলব থাকলে তিনি অনেক ঐশ্বর্য সংগ্রহ করতে পারতেন, কিন্তু সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ, তেমন তাঁর সহধর্মিণী। একালের ভোগী লোভী মানুষকে তাঁরা সত্যের পথ দেখাতে, শান্তিলাভের উপায় শেখাতে এসেছিলেন। তাঁদের আচরণ দেখে অপরে শিখবে।

উনবিংশ অধ্যায়

শেষ কথা

সন ১৩২৫ সালের মাঘ মাসে সারদাদেবীকে জয়রামবাটীতে যেতে হয়। এবার তিনি সেখানে প্রায় এক বৎসর থাকেন। পর বৎসর পৌষমাসে জন্মতিথির দিনে তাঁর সামান্য জ্বর হয়। ম্যালেরিয়া জ্বর—মাঝে মাঝে ভাল থাকেন, আবার পড়েন। এইভাবে জ্বরে ভুগতে ভুগতে তাঁর শরীর বিশেষ দুর্বল হয়ে পড়ে। এই অসুখের সময়েও অনেক ভক্ত জয়রামবাটী গিয়েছেন ও তাঁর কৃপা পেয়েছেন।

তার অসুখের সংবাদ পেয়ে স্বামী সারদানন্দ তাঁকে কলকাতায় আনার ব্যবস্থা করলেন সন ১৩২৬ সালের ফাল্গুন মাসে। যখন কলকাতায় এলেন তখন তাঁর শরীর অত্যন্ত শীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। কলকাতার শ্রেষ্ঠ কবিরাজ ও ডাক্তারদের দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু কোন চিকিৎসায় কোন ফল হ'ল না। কিছুকাল চিকিৎসার পর তাঁর কালাজ্বর হয়েছে বলে চিকিৎসকগণ স্থির করেন। সমস্ত শরীরে দিনরাত দারুণ জ্বালা—দিনেরাতে তিন-চারবার জ্বর উঠতে থাকে।

অসুখের যখন খুব বাড়াবাড়ি সেই সময় তিনি রাধু ও তার ছেলেকে জয়রামবাটীতে পাঠিয়ে দিতে বললেন। এই রাধুকে নিয়েই তিনি তাঁর মন এই সুখদুঃখ হাসিকান্না ভরা সংসারে আটকে রেখেছিলেন। এখন সেই রাধুকে পাঠিয়ে দেওয়ার আদেশ দেওয়ায়

তাঁর সেবক-সেবিকারা প্রমাদ গণলেন। রাধু না থাকলে তিনি শরীর ত্যাগ করে চলে যাবেন। সবাই মিলে তাঁকে অনুরোধ করলেন, রাধুকে থাকতে দেওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি অটল, বললেন, "না, মায়া কাটিয়েছি।"

এই দারুণ অসুখের সময়ও যতদিন পেরেছেন, নিজের কাজ নিজে করেছেন। কেউ কিছুক্ষণ সেবা করলেই তাঁর মনে লাগত ; ভাবতেন, সেবক বা সেবিকার বড় কষ্ট হচ্ছে। কেউ হয়তো পাখা দিয়ে তাঁকে একটু হাওয়া করছেন। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতে সেবককে বললেন, "না, আর হাওয়া করতে হবে না, তোমার হাতব্যথা করছে।"

বিছানায় শুয়ে শুয়েও তিনি তাঁর বাড়িতে যাঁরা থাকতেন বা যাঁরা তাঁকে দেখতে আসতেন, তাঁদের সকলের খোঁজখবর নিতেন। ডাক্তার কবিরাজ কেউ এলে ফেরার আগে যাতে ফল মিষ্টি কিছু খেয়ে যান সে বিষয়ে তাঁর নজর ছিল।

তাঁর শরীর যাওয়ার পাঁচদিন আগে একজন স্ত্রীভক্ত তাঁকে দেখতে এসেছেন। ঘরে ঢোকা বারণ বলে মেয়েটি দরজার ধারে বসে আছেন। সারদাদেবী বিছানায় পাশ ফিরবার সময় মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে ইশারা করে কাছে ডাকলেন। মেয়েটি প্রণাম করে কেঁদে বললেন, "মা, আমাদের কি হবে?" তিনি ক্ষীণস্বরে ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, "যদি শান্তি চাও মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ ; কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।" এই তাঁর শেষ উপদেশ। এই এক উপদেশ মেনে চলতে পারলে আমাদের জীবন সুখশান্তিতে ভরে উঠবে।

দেখতে দেখতে দিন ফুরিয়ে এলো। সন ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ মঙ্গলবার রাত দেড়টার সময় তিনি দেহত্যাগ করলেন। পরদিন তাঁর শরীর বেলুড় মঠে নিয়ে গিয়ে গঙ্গাতীরে সৎকার করা

হ'ল। যেস্থানে তাঁর শরীর দাহ করা হয়, সেইস্থানে একটি ছোট সুন্দর মন্দির নির্মিত হয়েছে। দেশবিদেশের শত শত নরনারী সেই মন্দিরে তাঁকে নিজেদের অন্তরের প্রণতি জানায়।

বিংশ অধ্যায়

শিক্ষা

নানা বয়সের নানা অবস্থার নরনারী দিনের পর দিন সারদাদেবীর কাছে গিয়েছে—তাঁর কথা শুনে প্রাণে শান্তি পাবার জন্য, তাঁর উপদেশ শুনে সেই মতো নিজেদের জীবন গড়ে তুলবার জন্য। যার যেমন দরকার বুঝে তিনি এক-একজনকে এক-একরকম উপদেশ দিয়েছেন। বেছে বেছে কতকগুলো সরল উপদেশ এখানে সংগ্রহ করা গেল।

১। সর্বদা কাজ করতে হয়। কাজে দেহমন ভাল থাকে। আমি যখন আগে জয়রামবাটীতে ছিলুম, দিনরাত কাজ করতুম।

২। কাজ করা চাই বৈকি ; কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। এক দণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়।

৩। চড় খেয়ে রামনাম অনেকেই বলে, কিন্তু শৈশব হতে ফুলের মত মনটি যে ঠাকুরের পায়ে দিতে পারে সে-ই ধন্য।

৪। নূতন ভক্তদের ঠাকুরসেবা করতে দিতে হয়, কারণ তাদের নবানুরাগ, সেবা হয় ভাল। সেবা করলেই কি হয়? সেবাপরাধ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা চাই। তবে কি জান? মানুষ অজ্ঞ জেনে তিনি ক্ষমা করেন।....চন্দনে যেন খিচ না থাকে, ফুল-বিল্বপত্র যেন পোকাকাটা না হয়। পূজায় বা পূজার কাজের সময় যেন

নিজের কোন অঙ্গে, চুলে বা কাপড়ে হাত না লাগে। একান্ত যত্নের সঙ্গে ঐসব করা চাই। আর ভোগরাগ সব ঠিক সময় দিতে হয়।

৫। পাপপুণ্য প্রসঙ্গ যেখানে হয় সেখানে যত লোক থাকে তাদের সকলকেই সেই ভালমন্দের একটু না একটু অংশ দিতে হয়।

(একজন প্রশ্ন করলেন, "কেন তা হবে?")

শোন মা, কেমন করে হয়। মনে কর, একজন তোমাদের কাছে তাদের পাপপুণ্যের কথা বলে গেল। মনে কখনও সেই লোকের কথা উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে তার ঐ ভালমন্দ কাজগুলিরও চিন্তা এসে পড়বে। এইরূপে সেই ভাল বা মন্দ দুই-ই তোমার মনের উপর কাজ করে যাবে।

৬। 'মা'র পথের সঞ্চয় করবার সাহায্য করতে পার তবেই তো ঠিক ছেলের কাজ করলে। তাঁর বুকের রক্ত খেয়ে এত বড় হয়েছ, কত কষ্ট করে তোমায় মানুষ করেছেন, তাঁর সেবা করা তোমার সব চেয়ে বড় ধর্ম জানবে। তবে তিনি যদি ভগবানের পথে যেতে বাধা দেন তখন অন্য কথা।

৭। (অল্প বয়সে বিধবা এক সুন্দরী নারীর প্রতি) কারু সঙ্গে মিশবে না, কারু জামাই বেয়াই কুটুম আসুক, তার কোন কিছুতে থাকবে না। 'আপনাতে আপনি থাক মন; যেয়ো নাকো কারো ঘরে।'... যার উপর যেমন কর্তব্য করে যাবে, কিন্তু ভাল এক ভগবান ছাড়া আর কাউকে বেসো না।

৮। মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার দিকে এগোতে চায় না। আমি আগে রাত তিনটার সময় উঠে প্রত্যহ ধ্যান করতুম। একদিন শরীর ভাল না থাকায় আলস্যবশতঃ করলুম না; তা ক'দিন বন্ধ হয়ে গেল। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আন্তরিক খুব যত্ন ও রোক চাই।

৯। ভাঙ্গতে সবাই পারে, গড়তে পারে ক'জনে? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সবাই, কিন্তু তাকে ভাল করতে পারে ক'জনে?

১০। সহ্যগুণ বড় গুণ—এর চেয়ে বড় গুণ আর নেই।

১১। ভাল কাজটি করা ভাল। ভালটি করলে মন ভাল থাকে, মন্দটি করলে কষ্ট পেতে হয়।

১২। যার মন শুদ্ধ সে সব শুদ্ধ দেখে। (গোলাপ-মাকে দেখিয়ে বললেন) এই গোলাপের মনটি শুদ্ধ। বৃন্দাবনে মাধবজীর মন্দিরে কাদের ছেলেমেয়ে বাহ্যে করে গিয়েছে। সবাই বলছে 'বিষ্ঠা' 'বিষ্ঠা,' কিন্তু কেউ ফেলবার চেষ্টা করছে না। গোলাপ তাই দেখে অমনি নিজের ধুতি—নতুন মলমলের ধুতি—ছিঁড়ে পুঁছে ফেলে দিলে।....এই গঙ্গার ঘাটে যদি কোন ময়লা থাকে তো গোলাপ হেতা সেথা থেকে ন্যাকড়া কুড়িয়ে এনে পরিষ্কার করে ঘটি ঘটি জল ঢেলে ধুয়ে দিলে। এতে দশজনের সুবিধে হ'ল। তারা যে শান্তি পেলো এতে গোলাপেরও মঙ্গল হবে, তাদের শান্তিতে এরও শান্তি হবে। অনেক সাধন-তপস্যা করলে, পূর্বজন্মের অনেক তপস্যা থাকলে তবে এজন্মের মনটি শুদ্ধ হয়।

১৩। বহু পাপ, মহাপাপ না হলে কি মন অশুদ্ধ হয়?....শুচিবা'ই মন আর কিছুতে শুদ্ধ হচ্ছে না। অশুদ্ধ মন অনায়াসে যায় না। আর শুচিবাই যত বাড়াবে তত বাড়বে। সবই যত বাড়বে তত বাড়বে।

১৪। সাধন বল, ভজন বল, তীর্থদর্শন বল, অর্থোপার্জন বল—সব প্রথম বয়সে করে নিতে হয়।....বৃদ্ধ বয়সে কফ-শ্লেষ্মায় ভরা, শরীরে সামর্থ্য নেই, মনে বল থাকে না—তখন কি কোন কাজ হয়?

১৫। হুজুগে পড়েও অনেকে অনেক বড় বড় কাজ করে ফেলে। কিন্তু মানুষের প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজটিতে শ্রদ্ধা দেখলে ঠিক ঠিক

মানুষ চেনা যায়।

১৬। (একটি মেয়ে খুব সেজেগুজে তাঁকে দেখতে এসেছে। মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বললেন) দেখ, স্ত্রীলোকের লজ্জাই হ'ল ভূষণ। ফুলটি দেবসেবায় লাগলেই সব চেয়ে সার্থক; না হয় গাছেই শুকিয়ে যাওয়া ভাল। কিন্তু আমার দেখে বড় কষ্ট হয়, যখন বাবুরা ফুলটি কখনও তোড়া করে, কখনও বা এমনি হাতে নিয়ে নাকের কাছে একবার ধরে বলে, 'বাঃ, বেশ গন্ধটি!' ওমা, পরক্ষণেই হয়ত মেঝেয় ফেলে দিয়েছে। জুতোয় মাড়িয়েই চলেছে। চেয়েও দেখলে না।

১৭। মানুষের মনে আঘাত দিয়ে কি কথা বলতে আছে? কথা সত্য হলেও অপ্রিয় করে বলতে নেই। শেষে ঐরূপ স্বভাব হয়ে যায়। মানুষের চক্ষুলজ্জা ভেঙ্গে গেলে আর মুখে কিছু আটকায় না। ঠাকুর বলতেন, "একজন খোঁড়াকে যদি জিজ্ঞাসা করতে হয়, তুমি খোঁড়া হলে কি করে?—তাহলে বলতে হয়, 'তোমার পা-টা অমন মোড়া হ'ল কি করে'?"

১৮। সংসারে কত রকম লোক থাকে। সব সহ্য করে থাকতে হয়। ঠাকুর বলতেন, "শ, ষ, স—তিনটে স। যে সয় সেই রয়।"

১৯। ঠাকুরের সত্যে কি আঁটই ছিল! আমাদের ও-রকম হ'ল কই? ঠাকুর বলতেন, 'কলিযুগে সত্যই তপস্যা। সত্যকে ধরে থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায়।'

২০। ঘরে রাঁধবার সব জিনিস আছে, রান্না করে খেতে হয়। যে যত সকালে রাঁধবে সে তত সকালে খেতে পাবে। কেউ সকালে খায়, কেউ সন্ধ্যায়, কেউ কুড়েমি করে রাঁধবার ভয়ে উপোস দেয়।.... যে যত বেশী সাধনভজন করে সে তত শীগগির দর্শন পাবে। সর্বদা সাধনভজন করতে পার না বলেই ঠাকুরের কাজ ভেবে কাজ করা দরকার।

২১। (কি করে ভগবান্ লাভ হয় ?) শুধু তাঁর কৃপাতে হয়। তবে ধ্যানজপ করতে হয়। তাতে মনের ময়লা কাটে। পূজা, জপধ্যান—এসব করতে হয়। যেমন ফুল নাড়তে নাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। নির্বাসনা যদি হতে পার—এক্ষুনি হয়।

২২। কাজকর্ম করবে বৈকি! কাজে মন ভাল থাকে। তবে জপধ্যান প্রার্থনাও বিশেষ দরকার। অন্তত সকাল সন্ধ্যায় একবার বসতেই হয়। ওটি হ'ল যেন নৌকার হাল। সন্ধ্যাকালে একটু বসলে সমস্ত দিন ভাল কি করলাম না করলাম তার বিচার আসে। তারপর গত কালের মনের অবস্থার সঙ্গে আজকার অবস্থার তুলনা করতে হয়। কাজের সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা জপধ্যান না করলে কি করছ না করছ বুঝবে কি করে ?

২৩। সর্বদা তাঁর স্মরণ মনন করে প্রার্থনা করতে হয়, 'প্রভু, সদ্বুদ্ধি দাও। সব সময় জপধ্যান করতে পারে ক'জন ? প্রথমটা একটু করে।....মনটাকে বসিয়ে আলগা না দিয়ে কাজ করা ঢের ভাল। মন আলগা পেলেই যত গোল বাধায়।

২৪। এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচুর দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচের দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

২৫। তাঁকে মনে করে খাবে-দাবে। যা কিছু খাবে, ভগবানকে দিয়ে খাবে। অপ্রসাদী অন্ন খেতে নেই। যেমন অন্ন খাবে তেমন রক্ত হবে। শুদ্ধ অন্ন খেলে শুদ্ধ রক্ত হয়, শুদ্ধ মন হয়, বল হয়। শুদ্ধ মনে শুদ্ধ ভক্তি হয়, প্রেম হয়।

২৬। ভগবানলাভ হলে কি আর হয় ? দুটো কি শিং বেরোয় ?

না, মন শুদ্ধ হয়? শুদ্ধ মনে জ্ঞানচৈতন্য লাভ হয়।

২৭। মানুষ এই আছে, এই নাই। কিছুই সঙ্গে যাবে না। একমাত্র ধর্মাধর্মই সঙ্গে যাবে। পাপপুণ্য মৃত্যুর পরও সঙ্গে যায়।

২৮। তাঁর (ঈশ্বরের) উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তিনি ভাল করতে হয় করুন, ডোবাতে হয় ডোবান। তবে ভাল কাজটি করে যেতে হয়। আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

২৯। ঈশ্বরেচ্ছা ছাড়া কিছু হবার সাধ্য নাই—তৃণটিও নড়ে না।

৩০। তিনিই জীব জন্তু সব হয়েছেন বটে, তবে সংস্কার ও কর্ম অনুসারে সকলে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে। সূর্য এক, কিন্তু জায়গা ও বস্তুভেদে তাঁর প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন রকমের।

৩১। ভগবানের জন্য কে সব ত্যাগ করতে পেরেছে? ঈশ্বরের শরণাগত হলে বিধির বিধি খণ্ডন হয়ে যায়। ভগবান লাভ হলে কি আর হয়? দুটো কি শিং বেরোয়? না, সদসৎ বিচার আসে, জ্ঞানচৈতন্য হয়, জন্মমৃত্যু তরে যায়।

৩২। ঠাকুর বলেছিলেন, "যার আছে সে মাপো (দান কর), যার নেই সে জপো (ভগবানের নাম কর)। তাও না পার, শরণাগত।—এইটুকু মনে রাখলেই হ'ল, আমার একজন দেখবার আছেন, একজন মা কি বাবা আছেন।

৩৩। তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে মনের দুঃখ জানাবে। ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বলো, "ঠাকুর আমায় তোমার দিকে নাও, আমায় শান্তি দাও।" এরকম করতে করতে তোমার প্রাণে শান্তি আপনিই আসবে।

৩৪। সাধন করতে করতে দেখবে, আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি। দুলে বাগদি ডোমের মাঝেও তিনি। তবে তো মনে দীনভাব আসবে।

৩৫। মন না মত্ত হস্তী! হাওয়ার সঙ্গে ছোটে। তাই সদসৎ

বিচার করে সব দেখতে হয়, আর খুব খাটতে হয় ভগবানের জন্য।

৩৬। মানুষের কার কতটুকু বুদ্ধি? কি চাইতে কি চাইবে, শেষে কি শিব গড়তে বানর হয়ে যাবে! তাঁর শরণাগত হয়ে থাকা ভাল। তিনি যখন যেমন দরকার তেমন দেবেন। তবে ভক্তি ও নির্বাসনা কামনা করতে হয়—এ কামনা কামনার মধ্যে নয়।

৩৭। কত সৌভাগ্যে মা এই জন্ম, খুব করে ভগবানকে ডেকে যাও। খাটতে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়? সংসারের কাজকর্মের মধ্যেও একটি সময় করে নিতে হয়।

৩৮। ইন্দ্রিয়সংযম চাই। এই যে বিধবাদের এত সব ব্যবস্থা, সব ইন্দ্রিয়সংযমের জন্য।

৩৯। সেই আদিকাল থেকে কত লোক মূর্তি-উপাসনা করে মুক্তি পেয়ে আসছে, সেটা কি কিছু নয়? ব্রহ্ম সকল বস্তুতেই আছেন। তবে কি জান?—সাধুপুরুষেরা সব আসেন মানুষকে পথ দেখাতে, এক-একজন এক-একরকম বোল বলেন। পথ অনেক, সেজন্য তাঁদের সকলের কথাই সত্য। যেমন একটা গাছে সাদা, কালো, লাল নানা রকমের পাখী এসে বসে হয়ত হরেক রকমের বোল বলছে। শুনতে ভিন্ন হলেও সকলগুলিকেই আমরা পাখীর বোল বলি। একটাই পাখীর বোল, অন্যগুলো পাখীর বোল নয়—এমন বলি না।

৪০। তুমি যদি ঈশ্বরকে না ডাক—আর কত লোক তো তাঁকে মনেই করছে না—তাতে তাঁর কি? সে তোমারই দুর্ভাগ্য। ভগবানের এমনি মায়া যে, তিনি এইরকম করে সব ভুলিয়ে রেখেছেন —'বেশ আছে ওরা—থাক্।'

সমাপ্ত